দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৭০ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ২৯ জানুয়ারি ২০১৮।। ১৫ মাঘ - ১৪২৪
যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com

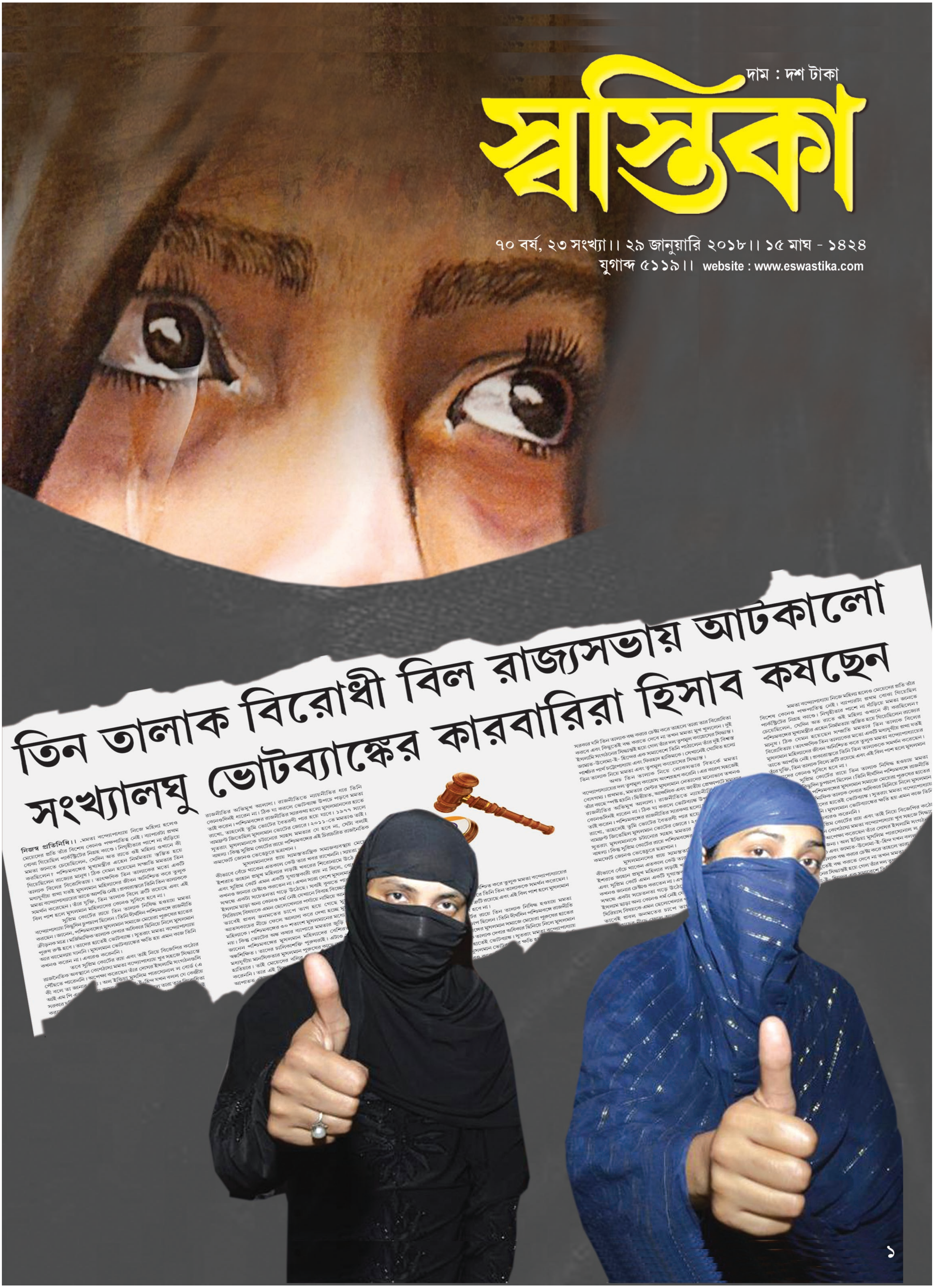

তিন তালাক বিরোধী বিল রাজ্যসভায় আটকালো সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের কারবারিরা হিসাব কষছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। .মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মহিলা হলেও মেয়েদের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। ব্যাপারটা প্রথম বোঝা গিয়েছিল পার্কস্ট্রিটের নিগ্রহ কাণ্ডে। নিগৃহীতার পাশে না দাঁড়িয়ে মমতা জানতে চেয়েছিলেন, সেদিন অত রাতে ওই মহিলা ওখানে কী করছিলেন? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন নির্মমতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যের মানুষ। ঠিক যেমন হয়েছেন সম্প্রতি মমতার তিন তালাক বিলের বিরোধিতায়। তাৎক্ষণিক তিন তালাকের মতো একটি মধ্যযুগীয় প্রথা যতই মুসলমান মহিলাদের জীবন অনিশ্চিত করে তুলুক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাতে আপত্তি নেই। প্রকারান্তরে তিনি তিন তালাককে সমর্থন করেছেন। তাঁর যুক্তি, তিন তালাক বিলে ত্রুটি রয়েছে এবং এই বিল পাশ হলে মুসলমান মহিলাদের কোনও সুবিধে হবে না।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তিন তালাক নিষিদ্ধ হওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি করছেন। জানেন, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে মেয়েরা পুরুষের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। মর্জিমাফিক তালাক দেবার অধিকার ছিনিয়ে নিলে মুসলমান পুরুষ রুষ্ট হবে। তাদের হাতেই ভোটব্যাঙ্ক। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ঝামেলায় যাননি। মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের ক্ষতি হয় এমন কাজ তিনি কখনও করেন না। এবারও করেননি।

তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তাই নিয়ে বিজেপির কঠোর রাজনৈতিক অবস্থানে কোণঠাসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সহজে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। অপেক্ষা করেছেন তাঁর দোসর ইসলামি সংগঠনগুলি কী বলে তা জানার

রাজনীতির অভিমুখ আলাদা। রাজনীতিতে ন্যায়নীতির ধার তিনি কোনওদিনই ধারেন না। ঠিক যা করলে ভোটব্যাঙ্ক উপচে পড়বে মমতা তাই করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সারকথা হলো মুসলমানদের হাতে রাখো, তাহলেই তুমি ভোটের বৈতরণী পার হয়ে যাবে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট জিতেছিল মুসলমান ভোটের জোরে। ২০১১-তে মমতাও তাই। সুতরাং মুসলমানকে চটানোর সাহস মমতার যে হবে না, সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পশ্চিমবঙ্গের এই চিরাচরিত রাজনৈতিক কমফোর্ট জোনও ভেঙেচুরে ছত্রাখান।

মুসলমানদের প্রায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মে
কীভাবে বেঁচে থাকেন এতকাল কেউ তার খবর রাখেননি। সায়রা
ইশরাত জাহান প্রমুখ মহিলার লড়াই খবরের শিরোনামে উঠে
এবং সুপ্রিম কোর্ট এমন একটি যুগান্তকারী রায় না দিলে, বো
কখনও জানার চেষ্টাও করতেন না। এখন সারা দেশে মুসলম
সম্বন্ধে একটা সচেতনতা গড়ে উঠেছে। সবাই বুঝতে পার
ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম নেই যেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ
সিরিয়াস বিষয়কে এমন ছেলেখেলার পর্যায়ে নামিয়ে আন
ভাবেই প্রবল জনমতের চাপে ভাগ হয়ে গেছে মু
আতসকাচের নীচে ফেলে আলাদা করে দেখা হচ্ছে মু
মহিলাকে। পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ মুসলমানের মধ্যে
নয়। কিন্তু ভোটের অঙ্ক কষার ব্যাপারে মমতার জুড়ি
জানেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান মহিলাদের বেশিরভ
স্বল্পশিক্ষিত। তাদের চালিকাশক্তি পুরুষরাই। এটাও
মধ্যযুগীয় মানসিকতার মুসলমান পুরুষের কাছে
হাতিয়ার। তাই মেয়েদের বলির
করেননি। তার এই সি
আপাতত

শিত করে তুলুক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রে তিনি তিন তালাককে সমর্থন করেছেন।
ত্রুটি রয়েছে এবং এই বিল পাশ হলে মুসলমান
হবে না।
র্টের রায়ে তিন তালাক নিষিদ্ধ হওয়ায় মমতা
চাপ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি
ঙ্গের মুসলমান সমাজে মেয়েরা পুরুষের হাতের
তালাক দেবার অধিকার ছিনিয়ে নিলে মুসলমান
হাতেই ভোটব্যাঙ্ক। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকার যদি তিন তালাক বন্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে তারা তার বিরোধিতা করবে এবং কিছুতেই বন্ধ করতে দেবে না তখন মমতা মুখ খুললেন। দুই ইসলামি সংগঠনের সিদ্ধান্তই হয়ে গেল তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। জামাত-উলেমা-ই- হিন্দের এক সমাবেশে তিনি পাঠালেন তাঁর দুই বিশ্বস্ত পার্শ্বচর পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং ফিরহাদ হাকিমকে। সেখানেই ঘোষিত হলো তিন তালাক নিয়ে মমতা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত।

অথচ তিন তালাক নিয়ে লোকসভার বিতর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস অংশগ্রহণ করেনি। এর কারণ সহজেই বোধগম্য। প্রথমত, মমতার মেন্টর মুসলমান নেতাদের মনোভাব তখনও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে মমতার
রাজনীতির অভিমুখ আলাদা। রাজনীতিতে ন্যায়নীতি
কোনওদিনই ধারেন না। ঠিক যা করলে ভোটব্যাঙ্ক উপ
তাই করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সারকথা হলো
রাখো, তাহলেই তুমি ভোটের বৈতরণী পার হয়ে
বামফ্রন্ট জিতেছিল মুসলমান ভোটের জোরে। ২০
সুতরাং মুসলমানকে চটানোর সাহস মমতার
বাহুল্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে
কমফোর্ট জোনও ভেঙেচুরে ছত্রাখান।
মুসলমানদের প্রায় সামন্তত
কীভাবে বেঁচে থাকেন এতকাল কেউ তার
ইশরাত জাহান প্রমুখ মহিলার লড়াই খ
এবং সুপ্রিম কোর্ট এমন একটি যুগান্ত
কখনও জানার চেষ্টাও করতেন না। এ
সম্বন্ধে একটা সচেতনতা গড়ে উঠে
ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম নেই যে
সিরিয়াস বিষয়কে এমন ছেলেখেলার
ভাবেই প্রবল জনমতের চাপে ভা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মহিলা হলেও মেয়েদের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। ব্যাপারটা প্রথম বোঝা গিয়েছিল পার্কস্ট্রিটের নিগ্রহ কাণ্ডে। নিগৃহীতার পাশে না দাঁড়িয়ে মমতা জানতে চেয়েছিলেন, সেদিন অত রাতে ওই মহিলা ওখানে কী করছিলেন? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন নির্মমতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যের মানুষ। ঠিক যেমন হয়েছেন সম্প্রতি মমতার তিন তালাক বিলের বিরোধিতায়। তাৎক্ষণিক তিন তালাকের মতো একটি মধ্যযুগীয় প্রথা যতই মুসলমান মহিলাদের জীবন অনিশ্চিত করে তুলুক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাতে আপত্তি নেই। প্রকারান্তরে তিনি তিন তালাককে সমর্থন করেছেন। তাঁর যুক্তি, তিন তালাক বিলে ত্রুটি রয়েছে এবং এই বিল পাশ হলে মুসলমান
দের কোনও সুবিধে হবে না।
সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তিন তালাক নিষিদ্ধ হওয়ায় মমতা
কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে মেয়েরা পুরুষের হাতের
মাফিক তালাক দেবার অধিকার ছিনিয়ে নিলে মুসলমান
দের হাতেই ভোটব্যাঙ্ক। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
নি। মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের ক্ষতি হয় এমন কাজ তিনি
বারও করেননি।
প্রিম কোর্টের রায় এবং তাই নিয়ে বিজেপির কঠো
ন কোণঠাসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সহজে সিদ্ধা
অপেক্ষা করেছেন তাঁর দোসর ইসলামি সংগঠ
জন্য। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল
) এবং জামাত-উলেমা-ই-হিন্দ যখন বলল
লাক বন্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে তারা
তেই বন্ধ করতে দেবে না তখন মমতা
নের সিদ্ধান্তই হয়ে গেল তাঁর দল

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ১৫ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৯ জানুয়ারি - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,
Website : www.eswastika.com

দাম : দশ টাকা
স্বস্তিকা
তিন তালাক বিরোধী বিল রাজ্যসভায় আটকালো
সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের কারবারিরা হিসাব কষছেন
১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18
R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯
খোলা চিঠি : হায় সীতা, হায় রাম! লাল যেন ফিকে লাল □ সুন্দর মৌলিক □ ১০
ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন □ গূঢ়পুরুষ □ ১১
দীপক মিশ্র উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য আসলে নরেন্দ্র মোদী □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২
জিতু সর্দারের নেতৃত্বে আদিনার সাঁওতাল বিদ্রোহের পঁচাশি বছর : একটি সমীক্ষা □ ড. তুষারকান্তি ঘোষ □ ১৪
'পরিস্থিতি স্বাভাবিক' দাবি করেও মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়মুখো হচ্ছেন না কেন? □ সাধন কুমার পাল □ ১৮
পুরুষের হাতে ভোটব্যাঙ্ক, মমতা তাই তালাকের পক্ষে □ সন্দীপ কুমার চক্রবর্তী □ ১৯
তিন তালাক আন্দোলনে মোদী সরকারের ভূমিকা 'ঐতিহাসিক' □ সৈয়দ তানভীর নাসরীন □ ২০
সাক্ষাৎকার— 'মোল্লা মৌলবিদের জন্য মুসলমান মহিলাদের এই দুর্দশা'— ইশরাত জাহান □ ২২
ভারতের বিদেশনীতির চালিকাশক্তি জাতীয়তা ও মানবতার সংমিশ্রণ □ এম জে আকবর □ ২৭
মহাতীর্থ দ্বারকা □ স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ □ ৩১
বিশ্বজয়ী বাঙালি যোগী শ্রীচিন্ময় □ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ৩২
মহাভারতের অপ্রধান নারী চরিত্র উলূপী □ দেবপ্রসাদ মজুমদার □ ৩৩
দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : শেষ বিচারের আশায় □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** □
অঙ্গনা : ৩৪ □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৭** □ **অন্যরকম : ৩৮** □
স্বজন বিয়োগ : ৩৯ □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নাগরিকপঞ্জী নবীকরণ নিয়ে রাজনীতি

অসমে নাগরিকপঞ্জী নবীকরণের কাজ চলছে। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশি মুসলমানদের চিহ্নিত করে তাদের বিতাড়িত করা। উদ্যোগটি সময়োপযোগী সন্দেহ নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ, বিচলিত। তাঁর অভিযোগ, নবীকরণের আড়ালে অসমকে বাঙালিশূন্য করার চক্রান্ত চলছে। একথা অনস্বীকার্য, তাঁর 'বাঙালি' মানে বাংলাদেশি মুসলমান। হিন্দু বাঙালি নন। মমতা ভালোই জানেন, অসমে বসবাসকারী হিন্দু বাঙালির কোনও ভয় নেই। তবুও তিনি রাজনীতি করছেন। কী তাঁর উদ্দেশ্য? জানা যাবে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায়। নাগরিকপঞ্জী নবীকরণ সংক্রান্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সমাবেশে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে স্বস্তিকা। লিখবেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, মোহিত রায় প্রমুখ।

দাম একই থাকছে — ১০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

AUTHENTIC INDIAN SPICES
SUNRISE
Shahi
Garam Masala

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি

রাজ্যের প্রতি কেন্দ্র সরকার বিমাতৃসুলভ আচরণ করিতেছে—এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর নূতন নয়। সেনাবাহিনী রাজ্যে টোল ট্যাক্স আদায় করিতেছে কিংবা যে বিমানটিতে তিনি কলকাতায় ফিরিতেছেন তাহা ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করাইয়া দেওয়া হইয়াছে—এমন অভিযোগ ইতিপূর্বে তিনি করিয়াছেন। সম্প্রতি রাজ্যের আটটি লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধের প্রস্তাব লইয়া রেলমন্ত্রকের পক্ষে পূর্বরেলের কমার্শিয়াল ম্যানেজার এস এস গোহলট রাজ্যের মুখ্যসচিব মলয় দে-কে যে চিঠি দিয়াছেন, তাহা লইয়া এইবারও মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। বলা হইয়াছে, রেল কর্তৃপক্ষ ওই চিঠি প্রত্যাহার না করিলে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ হইতেই সংসদে ও রাজ্য জুড়িয়া আন্দোলন করিবে তৃণমূল। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই মর্মে ঘোষণাও করিয়াছেন। গ্রাম-শহরে দলের পক্ষ হইতে বোঝানো হইবে যে বাংলার প্রতি বঞ্চনা হইতেছে।

ঘটনা হইল, যে আটটি রুট কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথা ভাবিতেছে, তাহা অলাভজনক বলিয়া রেলমন্ত্রক জানাইয়াছে। ওই রুটগুলিতে ট্রেনে যাত্রীসাধারণের ভিড় হইলেও তাহারা টিকিট না কাটায় রেলের ঘাটতি হইতেছে বলিয়া রেলকর্তাদের বক্তব্য। সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সুপারিশ মানিয়া তাই রুটিন চিঠি পাঠানো হইয়াছে। সেই চিঠিতে একথাও বলা হইয়াছে যে, রাজ্য যদি লোকসানের অন্তত ৫০ শতাংশ বহন করিতে রাজি থাকে তাহা হইলে জনস্বার্থে ওইসব লাইনে ট্রেন চালানো যাইতে পারে। রাজ্য বিজেপির পক্ষেও তৃণমূলের আন্দোলনের হুঁশিয়ারিকে মিথ্যাচার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কেন্দ্র রেলের কোনও শাখা বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই, বরং রাজ্যের মানুষের স্বার্থে তৃণমূল সরকার কেন ৫০ শতাংশ ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে না—এই প্রশ্নও তোলা হইয়াছে। বামপন্থীরা আবার আরও একধাপ আগাইয়া খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ, ২০১০-এ রেলমন্ত্রক এই বিষয়টি লইয়া চর্চা শুরু করিয়াছিল এবং ওই সময় একই ধরনের চিঠি রাজ্য সরকারকে দিয়াছিল। সেই সময় মমতা ব্যানার্জিই রেলমন্ত্রী ছিলেন বলিয়া তাহাদের অভিযোগ। ইহা লইয়া কংগ্রেসও ঘোলাজলে মাছ ধরিতে নামিয়া পড়িয়াছে।

বস্তুত, ইহা কোনও বিতর্কের বিষয় নয়। যে সব রুটে ট্রেন চলিতেছে তাহা বন্ধ করিবার কোনও প্রশ্নই উঠে না। যদি ওইসব রেলপথে লোকসান হয় তবে তাহা কীভাবে লাভদায়ক হইতে পারে, সেই বিষয়েই গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। লোকসান হইতেছে বলিয়া যাত্রীসাধারণকে এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করাও কোনও কাজের কথা নয়, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোধগম্য। কীভাবে এইসব রেলপথকে লাভজনক করা যায় তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে। রাজনৈতিক ফায়দা তুলিবার জন্য বিষয়টিকে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র বা রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ—এই অন্ত:সারশূন্য অভিযোগ ব্যর্থ হইবে ঠিক যেমনটি ঘটিয়াছে বিমুদ্রীকরণের ক্ষেত্রে। সাধারণ মানুষ যে আর রাজনৈতিক ভাঁওতার শিকার হইতে রাজি নয় পর পর কয়েকটি নির্বাচনের ফলাফলেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

সুভাষিতম্

অনাহূত প্রবিশতি অপৃষ্টো বহু ভাষতে।

অবিশ্যস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধম:।।

অনাহূতভাবে কোথাও প্রবেশ করা, জিজ্ঞাসা না করতেই বেশি বলতে শুরু করা, অবিশ্বাস্য কোনও কিছুকে বিশ্বাস করা—এ সবই মূর্খ ও নরাধমের লক্ষণ।

টালা ঝিলপার্কে নিহত আরতি সেনগুপ্তের বিচারের দাবিতে মিছিল

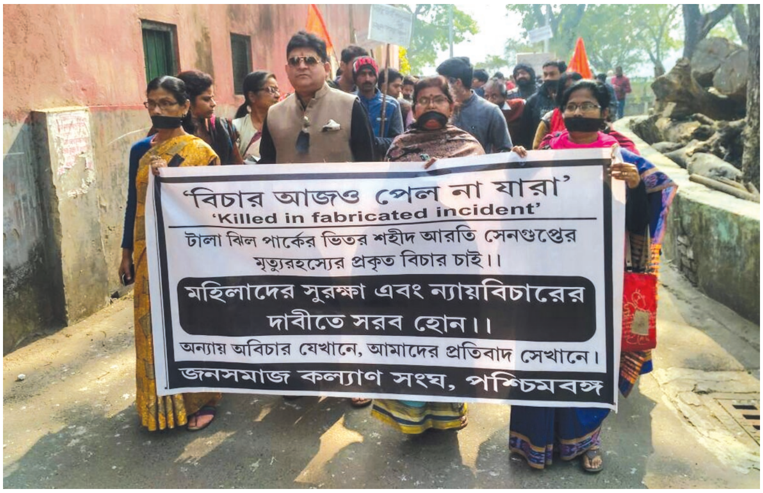
‘বিচার আজও পেল না যারা’
‘Killed in fabricated incident’
টালা ঝিল পার্কের ভিতর শহীদ আরতি সেনগুপ্তের
মৃত্যুরহস্যের প্রকৃত বিচার চাই।।
মহিলাদের সুরক্ষা এবং ন্যায়বিচারের
দাবীতে সরব হোন।।
অন্যায় অবিচার যেখানে, আমাদের প্রতিবাদ সেখানে।
জনসমাজ কল্যাণ সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ

সংবাদদাতা॥ হাইকোর্টের নির্দেশকেও অবজ্ঞা করছে পুলিশ, তদন্তের নামে প্রহসন হচ্ছে— ঠিক এই ভাষাতেই নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন কিংশুক সেনগুপ্ত, টালা ঝিল পার্কের ভিতর রহস্যজনক গাড়ির আঘাতে নিহত আরতি সেনগুপ্তের একমাত্র পুত্র। ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারির সেই অভিশপ্ত সকালের পরে পেরিয়ে গেছে অনেকগুলো বছর। জনরোষ সামাল দিতে পার্কের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্মৃতিফলক। কিন্তু বিচার মেলেনি আজও। কোনো এক অজানা কারণে সব জেনে বুঝেও অপরাধীদের আড়াল করতে চাইছে কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী টিম। তবে থেমে থাকেননি কিংশুক। থেমে থাকেনি এলাকার সাধারণ মানুষকে নিয়ে তাঁর লড়াই। সেই লড়ায়েরই অংশ হিসেবে প্রতিবারের মতো এবারও ১১ জানুয়ারি ওই স্মৃতিফলক প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয় আরতিদেবীর স্মরণসভা এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ। শামিল হলেন এলাকার বহু সাধারণ মানুষ। আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে পরিচিত অমল চাকি চৌধুরী, সাগ্নিক সেনগুপ্ত, স্বজন চক্রবর্তী, কমল সিংহ, অরিজিৎ দাসগুপ্ত, সুজিতা সাও, স্বদেশ জালাল, বিনীত সিংহ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আদিত্য ট্যান্ডন এবং অর্ক, রাজু, অভিষেক-সহ এলাকার উৎসাহী যুবকরা। গৈরিক পতাকা হাতে বিশাল মৌনমিছিল স্মৃতিফলক প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে পৌরসভার ৩, ৪, ৫ নং ওয়ার্ড পরিক্রমা করে। মিছিলে এলাকার মানুষ বিশাল সংখ্যায় পা মিলিয়ে বার্তা দিলেন— ‘মৃত্যু যে আজ জীবনের চেয়ে সোচ্চার প্রতিবাদে, মিছিলের দাবি ঢেউ হয়ে পড়ে শাসকের দরবারে।’

হাফিজ সইদের খোঁজ পাবে না রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরা, জানাল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সন্ত্রাস দমনে তাদের সদিচ্ছা তো দূর অস্ত, বরং সন্ত্রাসে মদত দিতেই তারা বদ্ধপরিকর— আরও একবার তা প্রমাণ করল পাকিস্তান। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে যে পরিদর্শক-দলের মুম্বই-হামলার প্রধানচক্রী ও জামাত-উদ-দাওয়া প্রধান হাফিজ সইদের খোঁজে পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল, তাদের সেখানে যেতে দিতে নারাজ পাক-প্রশাসন। ২০০৮ সালেই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ১২৬৭ সংখ্যক প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে হাফিজ সইদকে সন্ত্রাসবাদী তালিকাভুক্ত করে। হাফিজকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সব ক’টি দেশ এককাট্টা হলেও চীনের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। ভারত-আমেরিকার যৌথ চাপের কাছে অবশেষে রাষ্ট্রপুঞ্জ গত সপ্তাহে তাদের এক প্রতিনিধি দলকে ইসলামাবাদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিশেষ দলটির বিভিন্ন নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাক-প্রশাসন কী ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে তা দেখবার কথা। এর মধ্যে হাফিজের জামাত-উদ-দাওয়া ছাড়াও লস্কর-এ-তৈবা, আল-কায়েদা, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, লস্কর-এ-জঙ্গভি, ফলহা-এ-ইনসানিয়াত-ফাউন্ডেশন-এর মতো নৃশংস জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিও রয়েছে। পাক বিদেশমন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে উদ্ধৃত করে ‘দ্য নেশন’ জানিয়েছে যে এই দলকে কোনোভাবেই হাফিজ সঈদ বা জামাত-উদ-দাওয়া সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন এই আলোচনা প্রক্রিয়াটিও পাকিস্তানের তরফ থেকে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। ২০১৭-র জানুয়ারি থেকে হাফিজকে গৃহবন্দি রাখা হলেও নভেম্বরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। পাক-সেনা, গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর সহযোগী হাফিজকে কোনোদিনই পাকিস্তানের মাটিতে যে শাস্তি দেওয়া যাবে না, সেটা এখন আমেরিকা-সহ সব দেশই বুঝতে পারছে। বরং মুক্তির পর ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসে নয়া উদ্যমে নেমেছে হাফিজ, আর তাকে মদত জোগাচ্ছে পাক-প্রশাসনই। ‘দ্য নেশন’-এর সংবাদ সেটিকেই আরও একবার প্রমাণ করল।

‘পুবে ক্রিয়াশীল হও’ নীতি সার্থক রূপায়ণের পথে ভারত : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত সরকারের ‘পুবে তাকাও’ (লুক ইস্ট) নীতি মোদী সরকারের আমলে ‘পুবে ক্রিয়াশীল হও’ (অ্যাক্ট ইস্ট) রূপায়ণের পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সাধারণতন্ত্র দিবসের চারদিন আগে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে এন সি সি (ন্যাশনাল ক্র্যাডেট কর্প) শিবিরে এসে এই মন্তব্য করেন তিনি। সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে দশটি আশিয়ান দেশ— থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস ও ব্রুনেই-এর রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন যে, ভারতের ‘পুবে ক্রিয়াশীল হও’ নীতি সার্থক রূপায়ণের পথে এগোচ্ছে।

কূটনীতিকরাও মনে করেন যে, আশিয়ান অন্তর্ভুক্ত ভারতের প্রতিবেশী দশটি দেশের নেতাদের এদেশের সাধারণতন্ত্র দিবসে উপস্থিত করানো মোদী সরকারের মাস্টার-স্ট্রোক, অন্তত ভারতের নিরাপত্তার দিক থেকে। চীন-পাকিস্তানের যৌথ ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় এই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষাগত আদান-প্রদান যেমন জরুরি, তেমনি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি ও ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ যথেষ্ট কার্যকরী বলে তাঁরা মনে করেন।

মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশের সুরক্ষায় বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এন সি সি প্রশিক্ষণকে আরও বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা। ১৯৮৯ সাল থেকে এন সি সি ক্যাডেটদের জন্য রক্ষামন্ত্রী পদক সম্মান চালু রয়েছে। মোদী সরকার এই পদকের ক্ষেত্রে বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করেছে। ওইদিনই প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই পদক দিতে গিয়ে যুবসমাজের মধ্যে স্বাভিমান, দেশাত্মবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, আত্মবিশ্বাস ও দেশের জন্য অভিযানের রোমাঞ্চ অনুভবের ক্ষেত্রে এন সি সি-র গুরুত্ব উল্লেখ করেন এবং সার্বিক প্রসারের আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশ ডিরেক্টোরেটের ক্যাডেট প্রিয়া গত বাইশ জানুয়ারি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাত থেকে রক্ষামন্ত্রী পদক লাভ করেন।

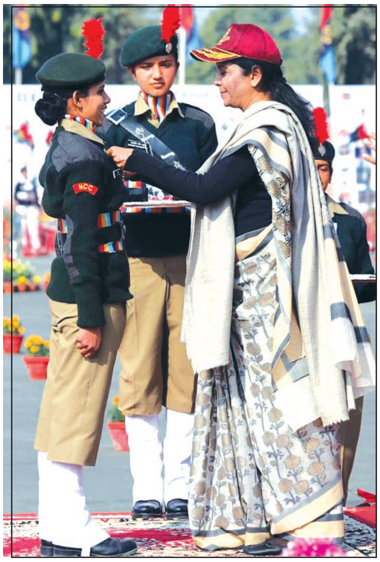

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ এন সি সি ক্যাডেটদের পদকে ভূষিত করছেন।

একটি সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে এন সি সি-তে নথিভুক্ত ক্যাডেটের সংখ্যা ১৩ লক্ষ। ২০২০ সালের মধ্যে তা পনেরো লক্ষে পৌঁছোনোর কর্মসূচি মোদী সরকার নিয়েছে। দেশের সুরক্ষা ছাড়াও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রেও এন সি সি ক্যাডেটদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের শিবিরে ২৯টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ২০৭০ জন এন সি সি ক্যাডেট উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের সামনে সাধারণতন্ত্র দিবসের বিশেষ প্রদর্শনে অংশ নেওয়া ছাড়াও ২৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রী র‌্যালিতেও এঁরা যোগ দেন।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ইঙ্গিত

চলতি অর্থবর্ষে ভারতের সম্ভাব্য বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চলতি অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই এম এফ)। নোটবাতিল এবং জিএসটি চালু হওয়ার ফলে ২০১৬ ও ২০১৭-তে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সাময়িক মন্দা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওই দুই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হয়েছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের তরফ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভারত বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বিকাশশীল দেশ। ২০১৮-তে ভারতের সম্ভাব্য আর্থিক বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ। তুলনায় চীন অনেকটাই পিছিয়ে। ২০১৮-তে তাদের বৃদ্ধি হতে পারে ৬.৪ শতাংশ। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এক সম্মেলনে বলা হয়, ২০১৯ সালে ভারতের সম্ভাব্য আর্থিক বৃদ্ধি ৭.৮ শতাংশে পৌঁছে যেতে পারে। অন্যদিকে ২০১৮ সালে আমেরিকার বৃদ্ধি হতে পারে ২.৭ শতাংশ এবং ২০১৯-এ ২.৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৬ এবং ২০১৭-তে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ছিল ৬.৭ শতাংশ। গত বছরের অক্টোবরেই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল সাময়িক মন্দা অতিক্রম করে ভারতের অর্থনীতি শীঘ্রই আবার স্বমহিমায় ফিরবে। কিন্তু মিডিয়ার একাংশ এবং দেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অনর্থক হৈচৈ শুরু করে। অর্থনীতির পুনরুত্থানের এই সম্ভাবনায় তারা যে জবরদস্ত ধাক্কা খেল তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

বিমুদ্রীকরণের সময় ২০ লক্ষ বা তার বেশি টাকা জমা পড়া ২ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আই-টি কর্তাদের নজরে

বিমুদ্রীকরণের পর ২ লক্ষ ব্যক্তি তাদের ব্যাঙ্কের খাতায় বাতিল হওয়া ৫০০ ও ১০০০ টাকার ২০ লক্ষ বা ততোধিক টাকা জমা করেছেন আয়কর দপ্তর তাদের অর্থের উৎস জানতে চিঠি পাঠিয়েছিল। যথেষ্ট অপেক্ষার পরও ওই সমস্ত জমাকারীরা হয় সদুত্তর দিতে পারেনি নয়তো ট্যাক্স রিটার্নই ফাইল করেনি। আয়কর দপ্তরের এক কর্তার কথায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হিসেবের খাতা স্বচ্ছ করার সুযোগ দিতে দপ্তর বাৎসরিক রিটার্ন জমা দেবার শেষ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু দপ্তরের ওই প্রয়াসকে জমাকারীরা উপেক্ষা করায় তাদের নোটিশ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, চলতি বছরে আয়কর দপ্তরের ওপর বিশেষ নির্দেশিকা জারি করে কর-খেলাপীদের পাকড়াও করতে তৎপর হতে চাপ দেওয়া হয়। এছাড়া সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-এর তরফেও দেশব্যাপী কর ফাঁকিবাজদের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের কৌশল নেওয়া হয়েছিল। যাতে তারা সরকারকে ঠকিয়ে খোলাখুলি ঘুরে না বেড়ায়। সূত্র অনুযায়ী, সিবিডিটি অধিকর্তা সুশীল চন্দ্র তাঁর অফিসারদের জরুরি আদেশ দিয়ে কর-ফাঁকিবাজদের ধরা ও সৎ করদাতাদের পুরস্কৃত করার ওপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

১৮ লক্ষ এমন ব্যাঙ্ক-খাতার সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে বিমুদ্রীকরণের সময় ৫ লক্ষ বা তার বেশি টাকা জমা পড়েছে এমন অ্যাকাউন্টধারীদের নোটিশ জারি করার পর ১২ লক্ষ জমাকারীর তরফে দপ্তর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পেয়েছে বলে খবর। কিন্তু ২ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকার হিসেব সন্দেহজনক বলে চিহ্নিত হয়েছে। যা ব্যাঙ্কে ফিরে আসা ১৫ লক্ষ বাতিল টাকার এক পঞ্চমাংশ।

উল্লেখিত ৫ লক্ষাধিক আমানতকারী আয়কর দপ্তরের তলবে সাড়া দেয়নি, সরকারের আদেশ অনুযায়ী প্রথমে তাদের ধরতে আয়কর দপ্তর ৭০ হাজার ব্যক্তি বা সংস্থাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমাবেশে নরেন্দ্র মোদী

‘ভারতের মতো শিল্পবান্ধব দেশ কোথাও পাবেন না’

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারত মানেই ব্যবসা-বাণিজ্য। শিল্পস্থাপনের জন্য এমন শিল্পবান্ধব পরিকাঠামো বিশ্বের আর কোনও উন্নয়নশীল দেশে নেই। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে আয়োজিত সারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সিইও-দের সমাবেশে সম্প্রতি এই কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ৪০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সিইও। ভারত থেকে গিয়েছিলেন ২০ জন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিজয় গোখলে, জয়শঙ্কর রমেশ অভিষেক প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকেরা। এরা প্রত্যেকেই সাম্প্রতিক অতীতে বিবিধক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত মানেই বাণিজ্যের উপযুক্ত পরিবেশ। ভারতকে বিশ্ব-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু সুযোগ এনে উপস্থিত করেছে যা অন্যদেশে বিরল।

অনুষ্ঠানের শেষে অর্থমন্ত্রকের মুখপাত্র রবিশকুমার এক টুইট বার্তায় সিইওদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী কীভাবে ভারতের সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে তাঁর বার্তা থেকে।

সম্মেলনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালন বার্সেটের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে দু’দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়। এই বৈঠককে সুইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম দুই গণতন্ত্রের ভাবসম্মিলন বলে উল্লেখ করেন। দু’দেশের সম্পর্ককে আরও ভালো করার জন্য তিনি কাজ করবেন বলে সুইস প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি দেন।

ভারতের প্রত্যাঘাত, নিশ্চিহ্ন পাক সেনাছাউনি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি বেশ কয়েকবার পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি চালিয়েছে। কিন্তু আগেকার মতো ভারত চুপচাপ বসে থাকেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাঘাত করেছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তের রক্ষক বি এস এফ মাত্র তিন-চার দিনে ৯০০০ রাউন্ড মর্টার শেল ফায়ার করেছে বলে খবর। এর ফলে বেশ কিছু জায়গায় পাকিস্তানের সেনাছাউনি ধ্বংস হয়েছে। নিহত হয়েছে অনেক পাক সেনা।

কিছুদিন আগেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক পদস্থ অফিসার জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করায় সীমান্ত পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। তারপরই ভারত প্রত্যাঘাত হানতে শুরু করে। পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি মর্টার লঞ্চিং প্যাড, রেঞ্জারদের অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বালানি রাখার জায়গা এবং একাধিক সেনাছাউনি ধ্বংস হয়ে যায়।

ভারতীয় সেনার এই উজ্জীবিত ভূমিকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। তিনি বলেন, ‘সরকার কোনওভাবেই ভারতের মাথা নীচু হতে দেবে না।’ পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ‘পাকিস্তান যদি এইভাবে বারবার যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে তাহলে আর একবার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা ছাড়া ভারতের অন্য কোনও উপায় থাকবে না।’

ক্যানসার নিরাময়ে প্রাচীন চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রোগ নিরাময়ে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। একেবারে শিকড়ে ফিরে গিয়ে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে রোগীরা দ্রুত এবং সহজে সেরে উঠবেন। টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের স্নাতকস্তরের ডিগ্রিপ্রদান অনুষ্ঠানে এই কথা বলেছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষকদের আয়ুর্বেদে বর্ণিত ক্যানসার নিরাময় পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ক্যানসার চিকিৎসার খরচ আরও কম হওয়া উচিত। সারা ভারতে যেসব অসুখে মানুষের মৃত্যু হয় তাদের মধ্যে ক্যানসার অন্যতম। ক্যানসার রোগটি যে শুধুমাত্র ভয়াবহ তাই নয়, এর চিকিৎসা খরচসাপেক্ষও বটে। সঠিক সময়ে রোগনির্ণয় করা গেলে দেশের ঘাড় থেকে অসুখের বোঝা অনেকখানি কমবে বলে তিনি জানান। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতীয়দের চিন্তাভাবনা এবং জীবনযাপন পদ্ধতি আরও মূলাশ্রয়ী হওয়া দরকার। যুবসমাজ যাতে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করে, যাতে অতিরিক্ত জাঙ্কফুড খাওয়ার অভ্যেস ত্যাগ করে— সে ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। তার জন্য অল্পবয়েসে যোগাভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল বিদ্যাসাগর রাও।

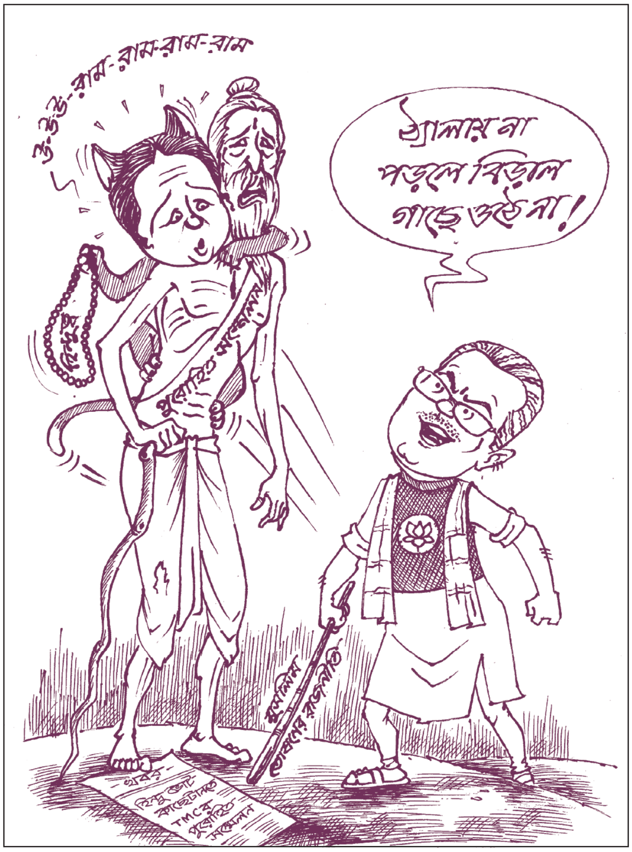
উঃ-উঁ-উঁ-রাম-রাম-রাম-রাম
ঠ্যালায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না!
হিন্দুত্ব
পুরোহিত সম্মেলন
মুসলিম তোষণের রাজনীতি
খবর
হিন্দু ভোট কাড়তে TMC-র পুরোহিত সম্মেলন

উবাচ

ভারত কারও ওপর আক্রমণ করে না, কাউকে বিদ্বেষ করে না। সবাইকে আশ্রয় দেওয়া হয়, সম্মান জানানো হয়। এটাই হিন্দুত্বের, হিন্দুস্থানের প্রকৃতি।

মোহন ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক, আর এস এস

গুয়াহাটিতে হিন্দু সম্মেলনে ভাষণে

সৌভাগ্যবশত কালাম স্যার আমার পূর্বসূরি ছিলেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হলেও আদতে তিনি ছিলেন একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী। আর মোদীজী আমার কাছে একজন সমাজ বিজ্ঞানী।

রামনাথ কোবিন্দ
ভারতের রাষ্ট্রপতি

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণে

পাকিস্তানের পারমাণবিক ধাপ্পাবাজির জবাব দিতে তৈরি রয়েছে ভারতীয় সেনা।

জেনারেল বিপিন রাওয়াত
ভারতের সেনাপ্রধান

গত ১২ জানুয়ারি সেনাদিবসে সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যে

ইরান থেকেই কুলভূষণকে অপহরণ করেছিল পাকিস্তান। ওই কাজের জন্য কুখ্যাত জঙ্গি মোল্লা ওমকে দায়িত্ব দিয়েছিল আই এস আই।

মামা কাদির
বালুচ নেতা

পাকিস্তানের মিথ্যাচার প্রসঙ্গে

বিভ্রান্তি ছড়িয়ে অসমের মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ভয় নেই, আমি আছি। আমি থাকতে কারও কোনও ক্ষতি হবে না।

সর্বানন্দ সোনোয়াল
অসমের মুখ্যমন্ত্রী

নাগরিকপঞ্জী নিয়ে অসমের বাঙালিদের ক্ষোভ প্রসঙ্গে

খোলা চিঠি

হায় সীতা, হায় রাম! লাল যেন ফিকে লাল

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা

হায় রে হায়! কালকে যে রাজা উজির, আজ সে ভিক্ষা চায়।

বছর ছ'য়েক আগেও যে সিপিএমের নির্দেশে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত তাদের কিনা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরতে হয়। কে হাত ধরবে তা নিয়েই দলের নেতারা লড়াই করছেন। দল গোছাবে কে? আসলে বিজেপির আগমনে কংগ্রেস তো বটেই এই রাজ্যে সিপিএমও কেমন যেন এক্সট্রা হয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে দল নির্বাচনী গাঁটছড়া বাঁধবে কিনা বা সমঝোতায় যাবে কিনা— এ নিয়েই সিপিএম-এর যত বিরোধ। সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির বক্তব্য, বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেসের হাত ধরা উচিত। অন্য দিকে, দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতের লাইন হলো, কংগ্রেসের হাত ধরার দরকার নেই। সিপিএম বা বামফ্রন্টের বাইরে যেসব বাম দলগুলি রয়েছে তাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলো।

এই রাজনৈতিক লাইনের উপরে কেন্দ্রীয় কমিটির ভোটাভুটিতে ইয়েচুরির লাইন কারাতপন্থীদের হাতে ৩১-৫৫ ভোটে পরাজিত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে গোঁসা হয়েছে সাধারণ সম্পাদকের। কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংখ্যালঘু হয়ে পদ ছাড়তে চেয়েছেন ইয়েচুরি। তাঁকে আটকেছে পলিটব্যুরো।

আপাতত তাঁকে আটকালেও কারাতের গোপন ইচ্ছে কিন্তু ইয়েচুরিকে হঠিয়ে নিজের পছন্দের কারোকে দলের সাধারণ সম্পাদকের পদে বসাতে। সে নিজের স্ত্রী বৃন্দা কারাতই হোন বা কেরলের রামচন্দ্রন পিল্লাই বা অন্ধ্রপ্রদেশের বিভি রাঘভুলুই হোন।

তিন বারের বেশি কেউ দলের কোনও একটি পদে থাকতে পারেন না। সেই ফর্মুলায় প্রকাশ কারাতকে সাধারণ সম্পাদকের পদ ছাড়তে হয়েছিল। গত পার্টি কংগ্রেসে নিজের পছন্দের লোককে বসাতে চাইলেও শেষ মুহূর্তে কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা ভি. এস. অচ্যুতানন্দনের 'অভিমান'-কে সম্মান জানিয়ে সীতারামকেই এই পদে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কারাত।

সুতরাং প্রথম থেকেই সীতা ছিলেন 'সংখ্যালঘু সাধারণ সম্পাদক'। রাজ্যসভায় নিজের মনোনয়ন হোক বা কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা--- সব বিষয়েই কারাতপন্থীদের চাপে পড়তে হয়েছে তাঁকে। কাজেই এ লড়াই নতুন নয়।

যেটা নতুন চর্চার বিষয় হতে পারে, তা হলো--- এপ্রিলে আগামী পার্টি কংগ্রেসে কাকে সীতারামের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবেন কারাতরা। যদিও সীতারাম বা তাঁকে সমর্থনকারী বঙ্গ-ব্রিগেড এখনও হাল ছাড়ছে না। তবু এই অপমান সহ্য করে দলের সাধারণ সম্পাদক পদে থেকে যাওয়া ইয়েচুরির পক্ষে সুখের হবে না।

কারাতের এই চালে পশ্চিমবঙ্গের জোটপন্থীদের পাকা ধানে মই পড়বে। ২০১৫ সালের পার্টি কংগ্রেসে বিজেপি ও কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব রাখার কথা বলেও, ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল সিপিএম। পরে সে নিয়ে জলঘোলা হয়েছিল দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে।

তবে এ বছর পার্টি কংগ্রেসে ক্ষমতার হাতবদল হয়ে গেলে, নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করাও আর সহজ হবে না। তখন নিজের শক্তিতেই লড়তে হবে সূর্য-বিমানকে। পশ্চিমবঙ্গে বামেদের আরও দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে পারে, যদি কারাতপন্থীদের চাপে তারা নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারে।

—সুন্দর মৌলিক

বিশেষ প্রতিবেদন

ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন

ধর্মানন্দ দেব

নির্বাচন কমিশনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ভোটের বাজনা বেজে গেছে। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। ত্রিপুরা বিধানসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে ১৪ মার্চ। এখন চলছে প্রার্থীপদ নিশ্চিতকরণের জন্য গোপনে গোপনে ঠোকাঠুকি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয়েছে ৩১ জানুয়ারি। সংবিধান অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভার আসন সংখ্যা ৬০ এবং তার মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর ৩১টি, তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসন হচ্ছে ১০টি এবং তফশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা হচ্ছে ১৯টি। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে ভারতীয় জনসঙ্ঘ মাত্র ৩টি আসনে প্রার্থী দেয় এবং সবকয়টি আসনেই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সিপিআই ১১টি আসনে প্রার্থী প্রদান করলেও মাত্র ১টি আসনে জয়লাভ করে এবং ৮টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সিপিএম ৫৭টি আসনে প্রার্থী প্রদান করে মাত্র ১৬টি আসনে জয়লাভ করে। কংগ্রেস ৫৯টি আসনে প্রার্থী প্রদান করে ৪১টি আসনে জয়লাভ করে এবং ভোট পায় ৪৫ শতাংশেরও বেশি।

১৯৭২ সালের ২০ মার্চ কংগ্রেস ত্রিপুরায় সরকার গঠন করে এবং সুখময় সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন। ১৯৭৭ সালে মাত্র ১১৬ দিনের জন্য কংগ্রেস ফর ডেমক্রেসি দল ত্রিপুরায় সরকার গঠন করে এবং মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন প্রফুল্ল কুমার দাশ। ১৯৭৭ সালে ১০২ দিনের জন্য জনতা পার্টির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় সরকার গঠন করে এবং রাধিকারঞ্জন গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ত্রিপুরায় আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৭৮ সালের ৫ জানুয়ারি নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দল সরকার গঠন করে। ১৯৮৮ সালে বামফ্রন্টকে হঠিয়ে কংগ্রেস আবার সরকার গঠন করে। অবশ্য সেজন্য রাজীব গান্ধীকে অনেক কসরত করতে হয়েছিল। কিন্তু রাজীব গান্ধীর প্রয়াণের পর ক্ষমতায় থাকার জন্য সিপিএমের সমর্থন নিতেও কংগ্রেস পিছপা হয়নি। আর তারই প্রতিদানে বলা যায় ১৯৯৩ সালে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৯৩ সালের ১০ এপ্রিল দশরথ দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় আবার ভারতের কমিউনিস্ট পাটি (মার্কসবাদী) দল সরকার গঠন করে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) মানিক সরকার ১৯৯৮ সালের ১১ মার্চ প্রথমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন এবং এখনও অবধি তিনিই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। ২০১২ সালের জানুয়ারির আগে অবধি চারটি জেলা ছিল যথাক্রমে ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা ও পশ্চিম ত্রিপুরা। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে চারটি আরও নতুন জেলা ঘোষণা হয়।

এক প্রকার ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপির ঝড় উঠতে থাকে। কমিউনিস্টমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিজেপি এগিয়ে চলছে। কেননা কেরল ও ত্রিপুরা ছাড়া দেশের অন্য কোনও রাজ্যে ক্ষমতায় নেই কমিউনিস্টরা। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম এখন অস্তিত্বসংকটে ভুগছে। আর ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনমত প্রকৃতপক্ষে দুটি ভাগে আড়াআড়ি ভাবে বিভক্ত হয়ে আছে। ত্রিপুরায় কংগ্রেস সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। জনমত বাম ও অবাম দুটি ভাগে বিভক্ত। অবাম শিবিরের নেতৃত্বে রয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি ১৯৯৩ সাল থেকে লাগাতার বাম শিবির ত্রিপুরার মসনদে থাকার সুবাদে দলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া রয়েছে। যা কাজে লাগাতে বিজেপি মরিয়া চেষ্টা করছে। নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য রাজনীতিতে অনেক নতুন নতুন সমীকরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রার্থী তালিকা নিয়ে সিপিআইএমে এবার যে ধরনের জট তৈরি হয়েছে, তা ইতিপূর্বে কখনই হয়নি। প্রার্থী তালিকায় পার্টির নীতিগত অবস্থান নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে। কেননা সিপিআইএম বরাবরই নির্বাচন ঘোষণার দিন তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু এবার তা পারেনি। বাস্তবে ১০,৩২৩ জন সরকারি কর্মচারীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আর 'পাশে আছি' বার্তা প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে সিপিএম। তাইতো সর্বশেষ ক্যাবিনেট বৈঠকেও ওই কর্মচারীদের ন্যূনতম পাওনা পাওয়া ঘুচিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ছিল সিপিএম। এছাড়াও সরকারি কর্মচারীরা চতুর্থ পে কমিশন অনুসারে বেতন গুণে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। চাকুরি ঝুলে থাকা ১০,৩২৩ জন বাদ দিলে দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ত্রিপুরা রাজ্যে। সরকারি হিসাব মতে ত্রিপুরা রাজ্যে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার বেকার রয়েছেন।

আর এইসব সুযোগকে হাতিয়ার করে বিজেপি যেন সমানে সমানে পাল্লা দিচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ভোটার রয়েছেন ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ২১৬ এবং তার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩ লক্ষ ৩ হাজার ৪২০ এবং মহিলা ভোটার ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৮৫ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১১ জন। সবশেষে বলব, বাম অপশাসন, দুর্নীতি দেখে দেখে ত্রিপুরা রাজ্যের আমজনতা শক্ত প্রতিপক্ষ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। তাই সিপিএমের হেসেখেলে প্রত্যাবর্তনের দিন শেষ। রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, সিপিমের অগস্ত্য যাত্রা শুরু হবে কি ত্রিপুরায়? বিজেপি কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে কৌশল করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই এবার লড়াই বড় শক্ত। প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন জানা যাবে আগামী ৩ মার্চ।

(লেখক একজন আইনজাবী)

দীপক মিশ্র উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য আসলে নরেন্দ্র মোদী

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

এবার ময়দানে প্রশান্ত ভূষণ। দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের চার বিক্ষুব্ধ বিচারপতির বক্তব্যের রেশ ধরে ময়াদানে নেমেছেন নরেন্দ্র মোদী বিরোধী শিবিরের অন্যতম মুখ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। চার বিক্ষুব্ধ বিচারপতির মতোই প্রশান্ত ভূষণও অভিযোগের তির ছুঁড়েছেন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রকে লক্ষ্য করে। এই আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, লখনউ মেডিক্যাল কলেজ মামলায় প্রধান বিচারপতি ঘুষ নিয়েছেন কিনা— তা নিয়ে তদন্ত হোক। প্রশান্ত ভূষণের মনে হয়েছে, সি বি আইয়ের ফোনে আড়ি পাতার যে টেপ প্রকাশ হয়েছে, তাতে প্রধান বিচারপতিকেই ঘুষ দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে বলে অনুমান করা যায়। ওই টেপে জনৈক ‘ক্যাপ্টেনে’র কথা বলা হয়েছে। প্রশান্ত ভূষণের ধারণা, ‘ক্যাপ্টেন’ বলতে প্রধান বিচারপতিকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশান্ত ভূষণ একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী। তাঁর জানা উচিত, আইনের চোখে অনুমানটা গ্রাহ্য নয়। আদালত একমাত্র তথ্য-প্রমাণকেই স্বীকৃতি দেয়। তবুও কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজের অনুমানের ওপর নির্ভর করে এই খ্যাতনামা আইনজীবী দেশের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এমন একটি মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন। কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই এরকম অভিযোগ আনা যে হাস্যকর এবং তা মানহানির পর্যায়ে পড়ে— তা প্রশান্ত ভূষণের মতো আইনজীবী জানেন না— এ ভাবা ভুল হবে। তবুও তিনি এরকম কথা বলেছেন। তাঁকে একথা বলতেই হবে। কেননা, খেলাটা অন্য জায়গায়। রহস্যটাও অন্যত্র। প্রশান্ত ভূষণের রাজনৈতিক পরিচয় এবং কোন রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে তাঁর নিত্য ওঠাবসা--- তা একটু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হবে না— দেশের প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্যবস্তু করার মূল উদ্দেশ্য কী।

আসলে, ঘোলা জলে যে অনেকেই মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন--- তা এই বিচারপতিদের বিক্ষোভের ঘটনায় আরও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তাঁর বিক্ষুব্ধ বিচারপতি জে চেলামেশ্বর, কুরিয়েন জোসেফ, রঞ্জন গগৈ এবং মদন লাকুরের সঙ্গে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের সংঘাত বেঁধেছে মূলত দুটি মামলাকে কেন্দ্র করে। এই দুটি মামলা হলো, ওড়িশার প্রাক্তন বিচারপতি আই এম কুদ্দুসির বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির মামলা এবং সোহরাবুদ্দিন সংঘর্ষ মামলায় বিচারপতি ব্রজগোপাল লোয়ার মৃত্যুতে জনস্বার্থ মামলাটি বিচারপতি অরুণ মিশ্রর বেঞ্চে পাঠানো কেন্দ্র করে। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের চার বরিষ্ঠ বিচারপতির মতপার্থক্য হতেই পারে। কিন্তু তার পরে চার বিক্ষুব্ধ বিচারপতি সাংবাদিক সম্মেলন করে যেভাবে ‘দেশের গণতন্ত্র সংকটের সম্মুখীন’ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন— তার সঙ্গে দেশের আর পাঁচটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের কোনও তফাত করা যাচ্ছে না। দুটি মামলাকে কেন্দ্র করে তাঁদের সঙ্গে প্রধান বিচারপতির মতপার্থক্য হলে, গণতন্ত্র কীভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে— তাও বোধগম্য হচ্ছে না। নাকি ‘গণতন্ত্র সংকটাপন্ন’ এই কথাটি হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার জন্যই তাঁদের এই সাংবাদিক সম্মেলন? এভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে বিচারপতিদেরই বিষোদ্গার এই ঘটনা অভূতপূর্ব। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় এরকমটি আগে ঘটেনি। তবে, চার বিচারপতির এহেন আচরণকে কিন্তু মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না এদেশের অনেক প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। সোলি সোরাবজি, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, কে কে বেণু গোপালের মতো প্রবীণ আইনজীবীরা চার বিচারপতির এই আচরণকে অনভিপ্রেত মনে করছেন। তাঁদের বক্তব্য, চার বিচারপতি এরকম না করে, তাঁদের বক্তব্য রাষ্ট্রপতির কাছে জানাতে পারতেন। চার বিচারপতির এহেন আচরণ দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কেই সাধারণের মনে সন্দেহ এবং সংশয় জাগিয়ে তুলবে এরকমই মনে করছেন প্রবীণ আইনজীবীরা।

> দুর্নীতির মামলা থেকে যারা গাঁ বাঁচিয়ে দূরে সরে পড়ছিল, তাদের জেলে যেতে হবে। বলা যায় না, হয়তো অযোধ্যায় রামমন্দিরটাও হয়ে যেতে পারে। অতএব ঘোলা জলে মাছ ধরতে নামো। যেমন, দলিত নিয়ে জল ঘোলা করা হয়েছে, তেমনই এবার ‘গণতন্ত্রের সংকট’ বলে জল আবার নতুন করে ঘোলা করে দাও।

চার বিক্ষুব্ধ বিচারপতি কেন রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হলেন না, কেন তাঁরা প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন— তার উত্তর একমাত্র তাঁরাই দিতে পারবেন। তবে এটা ঠিক— এই বিচারপতিরা যে ধরনের আচরণ করলেন— তাতে সাধারণ মানুষের মনে বিচার বিভাগ সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ এবং সংশয় জন্ম নেবে। এরকম চলতে থাকলে বিচার বিভাগ সম্পর্কে আস্থাও কিছুটা নষ্ট হতে পারে মানুষের। এবার এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে, বিচার বিভাগ সম্পর্কে সন্দেহ এবং সংশয় উসকে দেওয়ার জন্যই এত কাণ্ড কিনা? বিচার বিভাগে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আসলে অন্য কাউকে বিপর্যস্ত করাই কি এর প্রধান উদ্দেশ্য? বিচার বিভাগে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে কার বা কাদের তাতে সুবিধা— তা একটু খতিয়ে ভাবলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে।

প্রথমে দেখা যাক, চার বিক্ষুব্ধ বিচারপতি মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কারা বাজার গরম করতে আসরে নেমে পড়েছেন। প্রথম, জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। বিক্ষুব্ধ বিচারপতিরা যেদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে ‘গণতন্ত্র সংকটজনক’ এরকম অভিযোগ এনেছেন, ঠিক সেদিনই, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁদের

সুরে গলা মিলিয়ে একই কথা বলেছেন। তারও আগে থেকে অবশ্য রাহুল গান্ধী বিচারব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস দলগতভাবেও বিবৃতি দিয়ে এই বিক্ষুব্ধ বিচারপতিদের পাশে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়, তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতাও এই বিচারপতিদের সুরে সুরে মিলিয়েছেন। তারও আগে, সারদা-নারদা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তদন্ত শুরু হতেই মমতা বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয়ত, সিপিআই নেতা ডি রাজা। যেদিন বিক্ষুব্ধ বিচারপতিরা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, সেদিনই রাজা এই বিচারপতিদের অন্যতম চেলামেশ্বরের বাড়িতে গিয়ে একান্ত বৈঠক করেছেন। পরে, রাজা বলেছেন, ‘চেলামেশ্বর আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। যে ঘটনা ঘটেছে তাতে রাজনীতিকরাও দূরে থাকতে পারেন না।’ প্রশ্ন একটাই। প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে চার বিচারপতির ক্ষোভ থাকতেই পারে। কিন্তু একজন রাজনীতিককে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে আলোচনা করার অর্থ কী? চতুর্থত, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি আবার প্রধান বিচারপতিকে সরাসরি দুর্নীতিগ্রস্ত আখ্যা দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। রাহুল, মমতা, রাজা এবং প্রশান্ত ভূষণের ভিতর একটি বিষয়ে বড়ই মিল। তা হলো এঁরা সকলেই অবিলম্বে নরেন্দ্র মোদীর পতন চান।

এখন দেখার, প্রধান বিচারপতিকে আক্রমণ করে কীভাবে নরেন্দ্র মোদী নামক ব্যক্তিটির দুর্দম গতি আটকানো যায়। মনে রাখতে হবে, গত এক দশকে সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে ১৮৩টি দুর্নীতির মামলা দায়ের করেছিল। এই মামলাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত পূর্বতন কংগ্রেসি সরকারের মন্ত্রী এবং নেতারা। গত এক দশকে এই মামলাগুলির কোনও শুনানিই হয়নি। কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ১২টি বিশেষ আদালত গঠন করে এই দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। এ ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির সম্মতিও রয়েছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যদি ১২টি বিশেষ আদালত গঠন করে এই দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি শুরু হয়, তবে, সবথেকে বেশি বিপদ কার ঘনিয়ে আসবে? একটুও না ভেবেই বলে দেওয়া যায়— কংগ্রেসের। এখন, বিচার ব্যবস্থার ভিতরে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এই প্রক্রিয়াটিকে যদি আটকে দেওয়া যায় বা শ্লথ করে দেওয়া যায়— তাহলে কার লাভ? লাভ কংগ্রেসের এবং সেইসব রাজনৈতিক দলের নেতাদের যাদের নাম এই দুর্নীতির মামলাগুলিতে জড়িত রয়েছে।

দীপক মিশ্র তাঁর কার্যকালে কী কী উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন? ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর যেসব কংগ্রেস নেতারা শিখ নিধনে লিপ্ত হয়েছিলেন, সেই মামলায় গত এক দশকেও সুপ্রিম কোর্ট কোনও রায় দিতে পারেনি। দীপক মিশ্র প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর কার্যকালে নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে এই শিখ নিধন মামলার শুনানি করতে হবে। কংগ্রেস একদশক ধরে এই মামলার শুনানি আটকে রেখেছিল। এবার তা আর সম্ভব হচ্ছে না। এখন এই মামলার শুনানি শুরু হলে কংগ্রেস সবথেকে বিপদে পড়বে। আর বিচার ব্যবস্থার মধ্যে কোনও হইচই বাঁধিয়ে যদি এই প্রক্রিয়াটিকে আটকে দেওয়া যায়, তাহলে লাভবান হবে কংগ্রেস। অযোধ্যায় রামমন্দির সংক্রান্ত মামলায় বহু আগেই এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার রায়ে রাম মন্দিরকে মান্যতা দিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট দীর্ঘদিন এ মামলাটি ঝুলিয়ে রেখেছিল। কংগ্রেসও চেয়েছিল এ নিয়ে কোনও রায় যেন সুপ্রিম কোর্ট না দেয়। দীপক মিশ্র প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর কার্যকালে রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণার দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেস নেতা এবং আইনজীবী কপিল সিব্বাল আদালতে রায়দান স্থগিত রাখার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে ভর্ৎসিত হয়েছেন প্রধান বিচারপতির কাছে। এখন যদি রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষিত হয় এবং সে রায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কেই মান্যতা দেয়, তবে সবথেকে লাভবান হবে ভারতীয় জনতা পার্টি। আর অস্বস্তিতে পড়বে কারা--- অবশ্যই কংগ্রেস এবং অন্যান্য সেকুলারবাদী রাজনৈতিক দলগুলি। ফলে, বিচারব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এই প্রক্রিয়া শ্লথ করে দিতে পারলেই এখন কংগ্রেস এবং এদেশের অন্য সেকুলারবাদীদের লাভ। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র তাঁর কার্যকালে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন। তা হলো, তাঁর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চই তাৎক্ষণিক তিন তালাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে। কেন্দ্র সরকার আইন প্রণয়নের চেষ্টা করলেও, কংগ্রেস-সহ সেকুলারবাদী দলগুলি সে প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য সুপ্রিম কোর্টকে অমান্য করার নজির কংগ্রেস আগেও রেখেছে। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যখন শাহবানুকে খোরপোশ দেওয়ার পক্ষে রায় দেয়, তখন রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ইসলামিক মৌলবাদীদের মন রক্ষায় সংসদে বিল এনে সেই রায়কে অমান্য করেছিল।

আজ অনেকে অভিযোগ তুলছেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাজকর্ম নাকি গণতন্ত্র বিরোধী। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার পরিপন্থী। বলছেন, বিচারব্যবস্থাকে কবজা করছে সরকার। দেশের গণতন্ত্র হয়ে পড়ছে সংকটাপন্ন। যাঁরা একথা বলছেন, তাঁদের জানা উচিত— কাশ্মীর থেকে উৎখাত হওয়া হিন্দু পণ্ডিতরা, যাঁরা ঘরবাড়ি হারিয়েছেন, যাঁদের স্ত্রী-কন্যারা ধর্ষিতা হয়েছেন, যাঁরা নিজভূমেই পরবাসী, তাঁরা বিচার চেয়ে উচ্চ আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন। উচ্চ আদালত তাঁদের সেই আবেদন বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেছিল। কেন্দ্রে তখন এই সরকার ছিল না। এ নিয়ে কোনও সহৃদয় বিচারপতি তখন মুখ খোলেননি। কেউ বলেননি যে, এই কাশ্মীরি পণ্ডিতদেরও গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। সেই অধিকার সুনিশ্চিত করার দায় সুপ্রিম কোর্টের। সেই অধিকার লুণ্ঠিত হলেও তখন কেউ ‘গণতন্ত্রের সংকট’ এমন কথা বলেননি।

এখন অবশ্য বলছেন। এখন ঘোলা জলে মাছ না ধরতে পারলে শিখ দাঙ্গায় অভিযুক্তরা শাস্তি পেয়ে যাবেন। দুর্নীতির মামলা থেকে যারা গাঁ বাঁচিয়ে দূরে সরে পড়ছিল, তাদের জেলে যেতে হবে। বলা যায় না, হয়তো অযোধ্যায় রামমন্দিরটাও হয়ে যেতে পারে। অতএব ঘোলা জলে মাছ ধরতে নামো। যেমন, দলিত নিয়ে জল ঘোলা করা হয়েছে, তেমনই এবার ‘গণতন্ত্রের সংকট’ বলে জল আবার নতুন করে ঘোলা করে দাও। দীপক মিশ্র তো উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য যে আসলে একজনই— নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। ■

জিতু সর্দারের নেতৃত্বে আদিনার সাঁওতাল বিদ্রোহের পঁচাশি বছর : একটি সমীক্ষা

ড. তুষারকান্তি ঘোষ

১৯২৭ সাল। মালদহের বরেন্দ্রভূমিতে প্রবল উত্তেজনা। একটি কালীপূজাকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছে বনবাসী সমাজের প্রচুর সাঁওতাল ভাইয়েরা। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জিতু বোটকা বা জিতু সাঁওতাল। মালদহ ও দিনাজপুরের দুই জেলায় তীব্র উত্তেজনা। বরেন্দ্রভূমির এই বনবাসী সমাজ অরণ্যে পর্যবসিত বরেন্দ্রভূমিকে পুনরায় শস্যশ্যামল প্রান্তরে পরিণত করেছে। পাল বংশের সম্রাট রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী যে বরেন্দ্রভূমির গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন, এই বরেন্দ্রভূমি উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের প্রথমে সেই ক্ষেত্র শস্য সম্ভারের রূপে বিধৃত ছিল না। যা ছিল তা হলো অরণ্যাচ্ছিত অনাবাদী ভূমি।

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী ছিল কৃষক ও আরণ্যক সমাজ। ইংরেজদের প্রবর্তিত ভূমিরাজস্বের নতুন ব্যবস্থায় সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছিল কৃষক ও বনবাসী সাঁওতাল সমাজের। তাই দিকে দিকে ইংরেজের শাসনের প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ করে গণআন্দোলনের সূচনা করেছিল ভারতের এই জনগোষ্ঠী। তাই কুকি, নাগা, চাকমা, জামাতিয়া, ট্রিপি থেকে পাগলাপন্থী, চুয়ার, সাঁওতাল, কোল, ওঁরাও প্রভৃতি জনগোষ্ঠী কৃষক ও সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা করেছিল। বিহার, ঝাড়খণ্ড এলাকায় সাঁওতাল বিদ্রোহকে নির্মম ভাবে দমন করেছিল এই অত্যাচারী শাসকেরা। ফলে সাঁওতালেরা গঙ্গা পার হয়ে প্রাচীনের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র বরিন্দ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ২১৫ জন। ১৯২১ সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৩,৩৫১ জন। এদের পরিশ্রমে অহল্যাভূমি যখন উর্বরা হলো, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের রাজকর্মচারী, জমিদার, ইজারাদার মহাজনদের অমানুষিক শোষণও শুরু হলো।

আরেক সমস্যা এসে দেখা দিল এই বরিন্দ অঞ্চলে। জমির লোভে এখানে ছুটে এল মুর্শিদাবাদ থেকে শেরশা বাদিয়াদের দল। এদের পূর্বপুরুষ ছিল শেরশাহের সৈন্যবাহিনীর সৈনিক, যারা শেরশাহের সঙ্গে গৌড় আক্রমণ করেছিল। পরে এরা সৈনিকের বৃত্তি ছেড়ে কৃষিকর্মে যুক্ত হয়ে যায়।

জমিদার গোষ্ঠী এই শেরশা বাদিয়াদের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করল দুটি কারণে— (১) এদের দ্বারা লাঠিয়াল বাহিনী তৈরি করা যাবে এবং (২) জমিতেও কৃষিকর্মে নিয়োগ করা যাবে— কারণ শর্তানুসারে সাঁওতালের জমির চাইতে এরা খাজনা দেবে বেশি। ফলে জমিদার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা সাঁওতালদের জমি থেকে উৎখাত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করত না।

১৯২৮ সালে গাজোলে চাষভুক্ত জমি ছিল প্রায় ১৯৬ বর্গমাইল পরে তা ২৮৪ বর্গমাইলে এসে দাঁড়ায়, হবিবপুরে ছিল ১৫৫-৭১ বর্গমাইল, পুরাতন মালদহে ছিল ৬৭-১২৫ বর্গমাইল, বামনগোলায় ৬৯-১০২ বর্গমাইল। এই চারটি থানার মোট জমির মধ্যে বেদখল হওয়া সাঁওতালদের জমির পরিমাণ ছিল ১৬০ বর্গমাইল।

নবাবগঞ্জে জমি ছিল ৫৫-৯০ বর্গমাইল, গোমস্তাপুর ১২২-১৬৪ বর্গমাইল, নাচোলে ১০৯-১৭০ বর্গমাইল। এর মধ্যে সাঁওতালদের জমি বেদখল হয়ে যায় প্রায় ৯৪ বর্গমাইল। বরিন্দ অঞ্চলে দখলীকৃত সমগ্র জমির মধ্যে সাঁওতালদের জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ৬২.৫ অংশ।

জমিদাররা রায়ত ও রায়তের প্রজাদের মধ্যে খাজনার কীভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিলেন তার স্বরূপ তদানীন্তন রিপোর্টে জানা যায়। গাজোলে রায়তি প্রজার খাজনা ছিল ১ টাকা ৮ আনা ৫ পয়সা, হবিবপুরে রায়তি প্রজা দিত ১ টাকা ২৫ আনা ৩ পয়সা, আর রায়তের প্রজা দিত ৩ টাকা ১০ আনা ৬ পয়সা, বামনগোলায় ব্যবধান ছিল ২ টাকা ১ আনা ৬ পয়সা থেকে ৫ টাকা ১ আনা ১ পয়সা। ওল্ড মালদহে ১ টাকা ১২ আনা থেকে ৫ টাকা ৬ আনা ৩ পয়সা।

এছাড়াও সাঁওতাল চাষিদের দর্শনি,

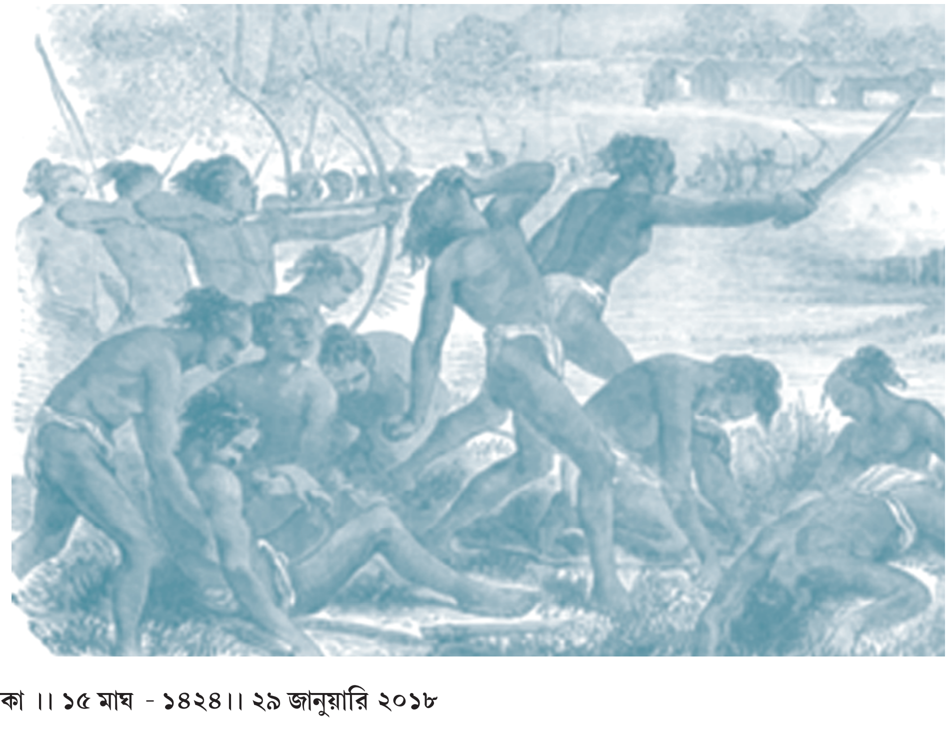

অনুষ্ঠানি বা পার্বণীর জন্য জমিদারদের খাজনা দিতে হতো। এমনকী খাজনা আদায়ের রসিদ, সেরেস্তার কর্মচারীদের বেতনও তাদের দিতে হতো। অসহায় চাষি পাঁচ টাকা ঋণ করলে চক্রবৃদ্ধি হারে পাঁচ হাজারে পরিণত হতো। মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেদের বহন করতে হতো ঋণ বা খাটতে হতো বেগার। কখনও বা নারীদের নিয়ে যেত ভোগসবর্স্বতার জন্য।

এই অত্যাচার সাঁওতালদের পক্ষে অসহ্য ছিল। তাদের অভাবের তাড়নায় লবণের প্যাকেট, একটা লণ্ঠন, ধুতি, শাড়ি বা শীতের একটা কম্বল দিয়ে সাঁওতাল চাষিদের কাছ থেকে জমিদারেরা লিখিয়ে নিয়েছিলেন হাজার হাজার একর জমি। জমিদারেরা যখন সাঁওতালদের কাছ থেকে শস্য নিতেন তখন স্বাভাবিক ওজনের চাইতে ভারী ছিল বাটখারা। একে বলত ‘বড় বউ’ বা কেনারাম, আর সাঁওতালদের যখন জমিদার শস্য দিতেন তখন ছিল ওজনের চাইতে কম ওজনের বাটখারা। একে বলতো বেচারাম বা ‘ছোট বউ’।

১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩২ সাল অবধি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনগুলো ঘটেছিল তাতে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, বরং তারা চেয়েছিল প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও ন্যায় বিচার। ইংরেজ সরকারের রাজকর্মচারীরা যখন জমিদারদের পক্ষ নিয়ে পাশে দাঁড়ালো তখনই এটি ব্রিটিশ বিরোধী রূপ গ্রহণ করল। “The Adina Movement was not originally anti British in character but gradually it was made anti British only when the local administration through the police came to the protection of intermediaries on the plea of maintainance of law and order situation...it (Adina Movement) had its roots in the economic grievance and opposition of the Muslim landlords, Jaigirdars and Talukdars, indebtedness and in ability to pay loan with higher rate of interest made the Adivasis landless.”

সাঁওতাল সমাজ সহজেই বুঝতে পারল তাদের মূল লড়াই লড়তে হবে ইংরেজদের সঙ্গে। সমস্ত অত্যাচারের প্রশ্রয়দাতা এই ইংরেজ সরকার। জোতদার, জমিদার, অত্যাচারী মহাজন সকলেই ইংরেজদের ছত্রছায়ায় সমবেত হয়েছে। এই রাজত্বের অবসান চাই। এখন জিতু সাঁওতালের রাজত্বের সূচনা পর্ব শুরু হয়েছে— এই পর্ব স্বাধীন ভারতের পর্ব। “A rumour circulated all over the Barind that 'Jitu's Raj' was to be inaugurated in early spring this year. Adhiars were advised to delay the payment of Adhi share as the coming settlement operation was expected to confer share croppers' Right to the land they till as their own jot holdinp.”

জমিদারদের মধ্যে ব্যাপক ভীতি সঞ্চারিত হলো। এই জমিদারেরা ইংরেজদের সহায়তায় ‘খোটকবলা’র (বন্ধকনামা)’ ও খোশকবলা (বিক্রিনামা বা জমিবিক্রির দলিল)-র মাধ্যমে অসহায় সাঁওতাল চাষিদের জমি গ্রাস করতে লাগল। এই অবস্থায় জিতু বামনগোলা, গাজোল প্রভৃতি এলাকার ভাদই ধান লুঠ করার আদেশ দিলেন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেলাশাসক পেডি ও পুলিশ সুপার এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য ছুটলেন বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে। জিতুকে, তাঁর ভাই অর্জুন-সহ আরও বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করা হলো। এই সময় জিতুকে আরও একদিক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করতে হলো, তা খ্রিস্টান মিশনারিদের। এই অবহেলিত নিরক্ষর বনবাসী সমাজকে হিন্দুধর্মের প্রবাহ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য মিশনারিরা সক্রিয় হয়ে উঠল। এবং শুরু হলো ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া। হিন্দু সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই বনবাসী সাঁওতাল সমাজকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য এদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন দিনাজপুরের এক প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী কাশীশ্বর চক্রবর্তী। তিনি ‘সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্’ নামে এক ধর্মান্দোলন শুরু করলেন। সাঁওতাল সমাজকে হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আনার জন্য শুরু করেছিলেন এক শুদ্ধি আন্দোলন। সাঁওতাল সমাজের এক বিশাল অংশ ফিরে এল তাঁর প্রচেষ্টায়। তিনি সাঁওতাল সমাজের গুরুস্থানীয় হয়ে উঠলেন। কাশীশ্বর চক্রবর্তী নিজে স্বরাজ্য দলের নেতা ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত সংস্কারের জন্য সাঁওতালেরা বহু নিষিদ্ধ খাবার ছেড়ে দেয়।

জিতুর রাজনৈতিক সচেতনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জিতু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ্য দলের অন্যতম বিশিষ্ট ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। মালদহ থেকে তিনি স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধি রূপে ফরিদপুর কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ফিরে এলে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন বিস্তৃত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি একটি তহবিল গড়ে তুললেন যার নাম দিলেন ‘গান্ধী ফান্ড’। জিতু সুভাষচন্দ্রকেও দেশে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য এই ফান্ড থেকে টাকা দিয়েছিলেন। জিতুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সর্বস্পর্শী ছিল। তিনি স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি চেয়েছিলেন বনবাসী সমাজকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ‘সত্যম্ শিবম্ গোষ্ঠী’র নেতা জিতু ও অর্জুন স্থির করলেন শক্তি আরাধনা করবেন। তাঁরা স্থির করলেন আদিনাতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হবে। একদিন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উদ্যোক্তরা স্বাধীনতার লড়াইকে দেখেছিলেন দেবাসুর সংগ্রাম রূপে। অসুর নিঃসন্দেহে ইংরেজ ও তার

সাঙ্গোপাঙ্গোরা। জিতুরা বিশ্বাস করতেন একমাত্রই মা কালীই টেনে নামাতে পারেন ইংরেজদের। অবসান ঘটাতে পারেন ব্রিটিশ শাসনের।

এঁদেরই উত্তরসূরী জিতু আর অর্জুনের দল আদিনাতে কালী সাধনায় ব্রতী হলেন। ভীত সন্ত্রস্ত ইংরেজ এই কালীপূজার আরাধনায় প্রমাদ গুনল। স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদের শাসনকর্তারা বন্ধ করতে চাইলেন এই কালীপূজা। গোটা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হলো। কিন্তু ১৯২৭ সালে হাজার হাজার সাঁওতাল জিতুর নেতৃত্বে সাড়া দিল। নিরাপত্তাবেষ্টনী দেওয়া হলো। কাশীশ্বর চক্রবর্তীর মালদহে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। কিন্তু হাজার হাজার সাঁওতাল মাতৃপূজায় অংশগ্রহণ করল। জিতু ও তাঁর সহকারী অর্জুনের বিরুদ্ধে প্রশাসন ১১০ ধারায় মামলা দায়ের করল। কিন্তু জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হলো ৮ মে ১৯২৭ সালে। মালদহের জেলাশাসক ছিলেন তখন জেমস পেডি এবং পুলিশ সুপার ছিলেন মি. স্প্রুট। তাঁদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে জিতুর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু করলো। জিতু-সহ ষাটজনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

কিন্তু শত বাধাতে জিতুর আন্দোলনকে দমানো গেল না। ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ এই ক'বছর জিতু বনবাসী সমাজের সংগঠনকে দৃঢ় করে তুললেন। কাশীশ্বর চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় সাঁওতাল সমাজকে হিন্দু সমাজের মধ্যে 'জলচল'-এ উন্নীত করার প্রচেষ্টায় জিতু ব্যাপক ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। খ্রিস্টধর্ম থেকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে নিয়ে এনে শুদ্ধি আন্দেলনের মধ্যে জিতুর সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক সাড়া দিয়েছিল বনবাসী সমাজ। হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরীয় সামাজিক গতি নিয়ে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করার ফলে সাঁওতাল সমাজ স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল তাদের শুভদিন আসছে, সেদিন তাঁরা তাদের স্বায়ত্ত শাসন ফিরে পাবে। জিতুর আন্দোলন মুর্শিদাবাদ থেকে আসা শেরশা বাদিয়াদের সাঁওতালের জমি দখলের প্রক্রিয়ায় ভীষণ ভাবে আঘাত করেছিল। ভারতীয় সনাতন ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জিতুর কার্যকলাপ ইংরেজ প্রশাসক ও জমিদার শ্রেণীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। বনবাসী সমাজের নিত্য অভাব, শোষণযন্ত্রের তৎপরতা, এই সমাজের সকল সম্পদ কেড়ে নিয়ে এদের সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে শাসক শ্রেণী কোনওরূপ অন্যায় দেখেননি— শুধু অন্যায় দেখলেন জিতুর বিদ্রোহের ক্ষেত্রে। বিশ্বের স্বৈরাচারীদের একই নীতি— সামাজিক কলাণের জন্য বিদ্রোহ হলেও তাকে দমন কর। জিতুর এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ গৌরবের সঙ্গে প্রকাশ করে চলেছিলেন 'গৌড়দূতে'র লালবিহারী মজুমদার ও 'মালদহ সমাচারে'র সত্যব্রত চক্রবর্তী।

জিতুর এই গণ বিদ্রোহের জন্য একটি দুর্গ জাতীয় স্থানের দরকার ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের নেতারা (দর্পদেব, মজনুশাহ) যেমন কালিন্দ্রী গঙ্গার তীরে পরিত্যক্ত রামাবতীর ভগ্নাবশেষকে আশ্রয়স্থল তৈরি করেছিলেন— ঠিক সেই ভাবেই "On 3rd December, 1932 Jitu occupied the ruins of Adhina mosque and conducted a debased form of Hindu worship in order to transform the mosque into Hindu Temple."

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস বহুবিপ্লবী সংস্থা এমনকী উপজাতীয় গণবিদ্রোহগুলোর ঘাঁটি ছিল ভগ্ন ঐতিহাসিক প্রাসাদ ও দুর্গ। জিতুও সেটা করেছিলেন। কোনও গবেষক মন্তব্য করেছেন, "Jitu said that he would go to Gour, at Pandua, that all would go with him there and that from there the 'largi' would begin which is to drive our Mohamadans and the other who do not join him." (Tanika Sarkar)। কারণটা ভিন্ন ছিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলা কোতুয়ালির মুসলমান জমিদার আব্দুল হায়াত খান চৌধুরী সাঁওতাল বর্গাদারদের কাছ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ ফসল দাবি করলো। বর্গাদারদের এই সংকটের সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করল গ্রামীণ মহাজনেরা। বর্গাদার নিজের খরচে ফসল ফলাত বলে তাদের চড়া সুদে টাকা ধার নিতে হতো। এই সুযোগে মহাজনেরা সুদের হার বৃদ্ধি করল আর জমিদাররা বৃদ্ধি করল জমির খাজনা। এই দ্বিমুখী অত্যাচারের উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালেরা জমি ছেড়ে পালাক। সাঁওতালদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। জিতু ও সাঘুর নেতৃত্বে সাঁওতালেরা কোতুয়ালির জমিদারদের পাণ্ডুয়ায় স্থিত বাড়ি ও ধানের গোলা আক্রমণ করল। অন্য অত্যাচারী মহাজনদের বাড়ি লুণ্ঠিত হলো। দিনাজপুর ও মালদহ জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এই সাঁওতাল বিদ্রোহ।

তদানীন্তন জেলাশাসক মিস্টার পেডির পুলিশবাহিনীর সঙ্গে জিতুর সংঘর্ষ হয়েছিল। মিস্টার পেডি রাজশাহির ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে সুপারিশ করেন জিতুকে আই. পি. সি.-র ১২৪-এ ধারায় গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক। জিতুর সংগ্রাম যে দীর্ঘদিন ধরে রচিত হয়েছে এবং যা হচ্ছে তা পূর্ব পরিকল্পিত— পেডি তা বোঝানোর চেষ্টা করেন।

১৯৩২-এর ৩ ডিসেম্বর জিতু বিশাল সংখ্যক সাঁওতালের মিছিল নিয়ে এসে আদিনা মসজিদে প্রবেশ করলেন। আদিনা মসজিদকে দুর্গের মতো করে গড়ে তোলা হলো, অন্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো। এই সংবাদ শহরে পৌঁছালো। এর মধ্যে ডি.এম. হয়ে এসেছেন জে.এন. তালুকদার ও এস. পি. হীরালাল সাহা। তাঁরা দ্রুত ছুটলেন আদিনায়— ওঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন জমিদার আব্দুল হায়াত খান চৌধুরী। তাঁরা জিতুকে আদিনা মসজিদ ত্যাগ করতে বললেন। তাঁদের কথায় কিন্তু তেমন কোনো ফল হলো না। এদিকে শহরের মুসলমানরা জিতুর আদিনা মসজিদে প্রবেশ করা নিয়ে এক ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে লাগল। তারা ডিএম-কে প্রতিবাদ জানালো। আদিনা মসজিদ সরকারের সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র ছিল। সেখানকার ভগ্ন প্রত্নস্থলে মুসলমানদের কোনওরূপ নামাজও হতো না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চলল।

সমগ্র জেলায় সংবাদ রটে গেল জিতু চৌকিদারি কর ও জমিদারদের খাজনা বন্ধ করার জন্য সাঁওতালদের নির্দেশ দিয়েছেন। ডিএম ১৩ ডিসেম্বরের রাত্রেই গাজোলের পুলিশ সাবইন্সপেক্টর সামসুল হোসেনকে নির্দেশ দিলেন জিতুকে গ্রেপ্তার করার জন্য। সামসুল

হোসেন ছুটলেন আদিনায়, কিন্তু সাঁওতালদের উগ্রমূর্তি ও সঙ্ঘবদ্ধতার স্বরূপ বুঝে শহরে সব খবর পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ফিরে এলেন গাজোলে।

জিতুর নেতৃত্বে বিশাল সাঁওতাল বাহিনী আদিনা মসজিদকে দুর্গে পরিণত করল। এই যুদ্ধকে সাঁওতালেরা স্বাধীনতার যুদ্ধই মনে করেছিলেন। জিতু ঘোষিত হলেন 'সেনাপতি গান্ধী' রূপে। সেই সময় সারা ভারতবর্ষে চলছে আইন অমান্য আন্দোলন। স্বাধীনতার এই আন্দোলনে গান্ধীজী ছিলেন জাতীয় নেতা। জিতু সেখান থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন।

১৯৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বর জেলা শাসক জে.এন. তালুকদার ও এস পি হীরালাল সাহা আমর্ড ইনস্পেক্টর টোকি সিংহ, দু'জন হাবিলদার ও প্রচুর কনস্টেবল-সহ আদিনা মসজিদ ঘিরে ফেললেন। ডি এম-এর সঙ্গে যোগ দিলেন খানসাহেব আবদুল হায়াত খান চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী, বিজয় কুমার নিয়োগী, নারায়ণ দাশ বেহানী, হায়াত খানের চিকিৎসক গিরিজা প্রসন্ন সেনগুপ্ত। জমিদারেরা নিজেদের বন্দুক নিয়ে গিয়েছিলেন আদিনাতে।

সরকারি বাহিনীর প্রবেশ বিপজ্জনক ছিল। তাই তারা ভগ্নস্তূপের দ্বারের বাইরে থেকে জিতুকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছিল। জিতু সমবেত মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের পশ্চিম দিকের দ্বার দিয়ে বের করে দিলেন। তারা গভীর অরণ্যে মিশে গেল। কিন্তু প্রায় তিনশো জনের সাঁওতাল বাহিনী নিয়ে জিতু প্রতিরোধ করলেন। তিনি জানতেন সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া এই দাবি তারা আদায় করতে পারবেন না।

জেলাশাসকের নির্দেশে চারদিক থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হলো। খানসাহেব-সহ অন্যান্য জমিদারেরাও তাদের অস্ত্র হতে ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করে চলেছিলেন। ডিসেম্বরের তীব্র শীতে এক অসম যুদ্ধ চলল। খালি গায়ে তির, বন্দুক, সড়কি, বল্লম, কোঁচ, শাবল, খন্তা নিয়েই জিতু বাহিনীর লড়াই, অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ ও জমিদার বাহিনীর লড়াই। সন্ধ্যায় জিতুর প্রতিরোধ কমে এল। অনেকেই আহত হয়েছিল। বীরদর্পে আদিনা মসজিদে প্রবেশ করল পুলিশ ও জমিদার বাহিনী। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই আহত যোদ্ধাদের টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হলো দুর্গ থেকে। অভিযোগ, আহত অবস্থায় জিতুকে গুলি করলেন কোতুয়ালির জমিদার। পুলিশের গুলিতে জিতুর মৃত্যু হয়নি।

Bengal Legislative council, Forty-First Session, 28, Feb, 1933, confidential Proceedings, Official Report-এ পাঁচজনের মৃত্যুর কথা জানানো হয়। এঁরা ছিলেন— (১) জিতু সাঁওতাল, (২) বারকা সাঁওতাল, (৩) জেখা সাঁওতাল। অন্য দুজনের পরিচয় জানা যায়নি। আহত হন— (১) ছোটকা সাঁওতাল, (২) মানো সাঁওতাল, (৩) কাচু সাঁওতাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিহত ও আহত হয়েছিল অনেক বেশি। জিতুর ভাই অর্জুন তো পায়ে গুলির আঘাতে আহত হয়ে, পরে গাংগ্রিন হয়ে মারা যান।

জিতুর হত্যা কাণ্ডের রিপোর্টকে পরিকল্পিত ভাবে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়। আহত অবস্থায় ধরা সত্ত্বেও জিতুকে হত্যা করা হলো কেন? রাজশাহির ডিভিশনাল কমিশনারের রিপোর্টে বলা হলো— "আহত অবস্থায় জিতুকে বের করে আনার সময় জিতু কোমর থেকে তলোয়ার নিয়ে এসপি-কে আক্রমণ করতে চায়, কিন্তু কোপ পড়ে কনস্টেবল দল বাহাদুরের মাথার উপর। এর পরেই গুলি বর্ষণ আরও বাড়াতে হয়।" কিন্তু জিতুর হত্যা তো পুলিশ করেনি? কমিশনারের রিপোর্ট এই প্রসঙ্গে নিশ্চুপ।

আদিনার ঘটনার পর সাঁওতাল পল্লীতে নারকীয় তাণ্ডব চালানো হলো। এরা সব 'ভদ্রস্থ' ভারতের সন্তান যারা ইংরেজদের গোলামি করে খাবার সংগ্রহ করতেন আর জমিদারবর্গ নিজেদের হিংসা চরিতার্থ করার জন্য যারা মনুষ্যত্বকে লাটে তুলে দিয়েছিল। জিতুর হত্যা মালদহের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে আদিনায় সাঁওতাল বিদ্রোহের উপরে চারজন সদস্য শান্তিশেখর রায়, মহেন্দ্র বসু, আবদুল মোমিন ও জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৫টি প্রশ্ন তোলেন। (সূত্র : ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ও শুভাশিস গুপ্ত)। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর ছিল জমিদার খানসাহেবকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে।

Mr. W.D.R. Prentai, Member-in-Charge of Police deptt. Bengal Government-এর উত্তরগুলো অদ্ভুত ছিল। (১) জমিদারেরা অস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে যাচ্ছেন এই রূপ বেআইনি কাজ তারা করলেন কেন? তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হলো? প্রেনটাই উত্তর দিলেন, "জমিদারেরা পুলিশদের সাহায্য করেছিলেন এই বিদ্রোহ দমন করতে। এবং এই সব কাজ করা হয়েছিল জেলা শাসকের অনুমতি নিয়ে।" প্রেনটাই অনুভব করেছিলেন আদিনার এই বিদ্রোহ সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ বা নীল বিদ্রোহ থেকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। তাই দমন করার প্রয়োজন ছিল। জিতুকে দমন করার জন্য জমিদাররা অস্ত্র প্রয়োগ করল ডি এমের অনুমতি পেয়ে— বিচিত্র ইতিহাস! সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতাদের মারার জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন এই জমিদারেরা।

কিন্তু জিতুর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়ি খোচাকান্দড়ে সেই মৃতদেহ ফিরে আসেনি। মালদহের মাটিতে এই গণঅভ্যুত্থানের নায়ক জিতুর মৃত্যু বড়ই শোকাবহ। এই বীরনায়ক সেদিন গণঅভ্যুত্থানের প্রেরণা পেয়েছিলেন মা কালীর আরাধনা থেকে। ভারত বর্ষের সকল স্বাধীনতার আন্দোলনগুলিতে ধর্মের প্রভাব ছিল— বীরসা মুণ্ডা, চাঁদ ভৈরব বা সিধু কানু থেকে পাগলাপন্থী, দুদু মিঞার দরাজি থেকে ওয়াহাবি, সবই তো ধর্মের আন্দোলনে গড়া। জিতুর প্রেরণা ছিলেন মা কালী, ভিত্তি ছিল প্রাচীন আদিনাথের মন্দির— যা ছিল পরিত্যক্ত, যার গহ্বরে গহ্বরে ছিল শিয়াল আর সরীসৃপের আনাগোনা। কিন্তু জিতুর এই সংগ্রাম ছিল সকল ধর্মের অত্যাচারিত মানুষের জন্য। মালদহের বিদ্বজ্জনেরা জিতুর মৃত্যুতে গৌরবজনক সম্মান জানাননি। অথচ এই নিস্পৃহ পণ্ডিতদের অনেককে দেখা গিয়েছিল এই গণঅভ্যুত্থানে নিহত এক কনস্টেবলের শোক মিছিলে। জিতুর মৃতদেহ কোথায় গেল কেউই দাবি করেনি।

আদিনা মসজিদের শক্ত নিরেট প্রস্তর প্রাচীরে ইংরেজ পুলিশের ছোড়া বারুদ আর গোলার ক্ষতচিহ্ন আজও মুছে যায়নি--- জ্বলজ্বলে দাগ আজও যেন জিতুর গৌরবের স্মৃতিতে পরিস্ফুট হয়ে আছে। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

‘পরিস্থিতি স্বাভাবিক’ দাবি করেও মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়মুখো হচ্ছেন না কেন?

সাধন কুমার পাল

বিমল গুরুংয়ের নির্বাসন ও জিটিএর প্রশাসনিক বোর্ডে সেই সঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চায় বিনয় তামাং, অনিত থাপাদের অভিষেক পর্বের পর পাহাড় স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে এই দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন ডিসেম্বরে তিস্তা রঙ্গিত উৎসব উপলক্ষে পাহাড়ে পা রাখবেন। ঘোষণা পর্যন্তই, আগাম বাতিল হলো মুখ্যমন্ত্রীর সফর। শিলিগুড়িতে থেকেও উৎসব উপলক্ষে পাহাড়মুখী হলেন না পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। ২৭ ডিসেম্বর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিনয় তামাং নিজেই পাঁচদিনের এই উৎসবের উদ্বোধন করলেন। উদ্বোধনের দিন কিছু লোকজন দেখা গেলেও বাকি দিনগুলিতে চেয়ারগুলিই ভরাতে পারেননি বিনয় তামাং অনিত থাপারা। এক রকম ফাঁকা মাঠেই সারতে হলো মুখ্যমন্ত্রীর বহুল প্রচারিত তিস্তা রঙ্গিত উৎসব। শুধু যে মন্ত্রীরা গেলেন না তা নয়, হতাশ করলেন পর্যটকরাও। ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পাহাড়ে এতটাই ভিড় হতো যে পর্যটকদের হোটেল খুঁজে পেতে সমস্যা হতো। এই উৎসব নিয়ে স্থানীয় মানুষদের মধ্যেও দেখা গেল সতর্ক মনোভাব। গোর্খালিগ, সিপিআর এম, জিএন এল এফ-এর মতো দলগুলি যোগ না দেওয়াতে এই উৎসব পরিণত হয়েছে মোর্চার আলোচনাপন্থীদের উৎসবে। ফলে তিস্তা রঙ্গিত উৎসবের মঞ্চকে ঘিরে তৈরি হওয়া মানুষের ভিড় প্রদর্শন করে পাহাড় স্বাভাবিক এই দাবি প্রমাণ করে চমক সৃষ্টির পরিকল্পনা আপাতত ব্যর্থ হলো।

তিস্তা রঙ্গিত উৎসবের পর উত্তরবঙ্গের সব জেলার সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাতেও অনুষ্ঠিত হবে উত্তরবঙ্গ উৎসব। শিলিগুড়ি থেকে এই উৎসবের উদ্বোধন করলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পাহাড়মুখী যে হচ্ছেন না সে কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, এই উৎসব উপলক্ষে অন্য কোনও নেতা মন্ত্রীও পাহাড়মুখী হচ্ছেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, কোনও অজানা আশঙ্কার জন্যই কি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা অদৃশ্য বিমলের ডেরায় পা রাখতে ভরসা পাচ্ছেন না, না পাহাড় দখলের রণনীতির অঙ্গ হিসেবেই তৃণমূলের নেতামন্ত্রীরা সশরীরে পাহাড়ে যাচ্ছেন না?

বামফ্রন্ট জামানায়ও শুধু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই নয় পাহাড়ে যেতে সাহস পেতেন না সিপিএমের নেতামন্ত্রীরাও। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাতেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এড়িয়ে চলতেন পাহাড়কে। সে সময় বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতা পাহাড় পরিস্থিতি নিয়ে তুলোধুনা করতেন সিপিএম নেতাদের। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রায় প্রতিমাসেই একবার করে পাহাড়ে যেতেন। ২০১৭ সালের জুন মাসে পাহাড়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকের দিন মোর্চার বিক্ষোভ কর্মসূচির জেরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যা হয়তো পাহাড় দখলের স্বপ্নে বিভোর নেতানেত্রীরা স্বপ্নেও ভাবেননি।

একদিকে রাজভবনের ভিতরে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করছেন সে সময় অন্য দিকে সেখান থেকে বড়জোর দুশো মিটার দূরে বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ, বাংলাভাষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার প্রতিবাদে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সদস্যদের বিক্ষোভের জেরে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ১২টি পুলিশ ভ্যানে আগুন, আত্মরক্ষার্থে পর্যটক-সহ আমজনতার এলোপাথাড়ি দৌড়— সে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের পরিস্থিতি। এরপর সেনা মোতায়েন, ১০৪ দিনের টানা বন্‌ধ, মোর্চার বিক্ষোভ আন্দোলন, পুলিশের গুলি টিয়ার গ্যাস, একাধিক মৃত্যুর মতো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যায়। পাহাড় হয়ে ওঠে আতঙ্কের আরেক নাম।

রাজ্য সরকার এই সমস্ত ঘটনার দায় মোর্চার ঘাড়ে চাপায়। মোর্চাকে ঠেকানোর জন্য মামলার ফাঁস ও পুলিশি তৎপরতার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলা হয় পাহাড়কে। মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং যাতে জনসমক্ষে আসতে না পারেন তার সমস্ত রকম আয়োজন করা হয়। আবার মোর্চা নিজেদের অহিংস গান্ধীবাদী দাবি করে এই সমস্ত ঘটনার দায় প্রশাসনের উপর চাপিয়ে, অভিযোগ আনে যে মমতা ব্যানার্জি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে পাহাড় দখলের জন্য এই সমস্ত অশান্তি তৈরি করছেন। মোর্চার আরও দাবি, কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই পুলিশ কর্মী অমিতাভ মালিকের মৃত্যু, অস্ত্র উদ্ধার করে মোর্চার ঘাড়ে দোষ চাপানো ইত্যাদি সমস্ত রহস্যের পর্দা ফাঁস হবে। আপাতত অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের সত্যতা জানার উপায় নেই। তবে একটি প্রশ্ন কিন্তু উঠছেই। দার্জিলিংয়ে এন এস সি এন, নেপালের মাওবাদী-সহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর সাহায্য নিয়ে গোলমাল পাকানোর প্রয়াস হচ্ছে, রাজ্যের তরফ থেকে এমন মারাত্মক অভিযোগ অনেকবার আনা সত্ত্বেও পাহাড় সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী কেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনও রকম কথা বলতে চাইছেন না?

রাজ্যের এই আচরণ থেকে কি মনে হয় না যে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই জঙ্গি তত্ত্ব আমদানি করা হচ্ছে?

শুধু প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে নয়, বিমল গুরুংকে রাজনৈতিক ভাবে ‘খতম’ করে দিতে মোর্চা নেতা বিনয় তামাং ও অনিত থাপাকে দল ভাঙিয়ে এনে বসিয়ে দেওয়া হয় দল ও জিটিএর শীর্ষ পদে। ফলে রাজনৈতিক ভাবে পাহাড় এখন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখলে থাকলেও মোর্চা এখন সম্পূর্ণ ভাবে নবান্নের নিয়ন্ত্রণে। রিমোট কন্ট্রোল মোর্চা দিয়ে যদি ২০১৯-এ দার্জিলিং লোকসভা আসন বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় তাহলে মন্দ কী! সুতরাং এখন সশরীরে ‘স্বাভাবিক’ পাহাড়ে যাওয়া কিংবা সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে রাজনৈতিক ভাবে পাহাড় দখলের মতো কর্মসূচি নিয়ে অদৃশ্য বিমল গুরুংকে রাজনৈতিক সুবিধে করে দেওয়ার মতো কাঁচা রাজনীতিক যে মমতা ব্যানার্জি নন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।■

পুরুষের হাতে ভোটব্যাঙ্ক, মমতা তাই তালাকের পক্ষে

সন্দীপ চক্রবর্তী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মহিলা হলেও মেয়েদের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। ব্যাপারটা প্রথম বোঝা গিয়েছিল পার্কস্ট্রিটের নিগ্রহ কাণ্ডে। নিগৃহীতার পাশে না দাঁড়িয়ে মমতা জানতে চেয়েছিলেন, সেদিন অত রাতে ওই মহিলা ওখানে কী করছিলেন? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন নির্মমতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যের মানুষ। ঠিক যেমন হয়েছেন সম্প্রতি মমতার তিন তালাক বিলের বিরোধিতায়। তাৎক্ষণিক তিন তালাকের মতো একটি মধ্যযুগীয় প্রথা যতই মুসলমান মহিলাদের জীবন অনিশ্চিত করে তুলুক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাতে আপত্তি নেই। প্রকারান্তরে তিনি তিন তালাককে সমর্থন করেছেন। তাঁর যুক্তি, তিন তালাক বিলে ত্রুটি রয়েছে এবং এই বিল পাশ হলে মুসলমান মহিলাদের কোনও সুবিধে হবে না।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তিন তালাক নিষিদ্ধ হওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি করছেন। জানেন, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে মেয়েরা পুরুষের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। মর্জিমাফিক তালাক দেবার অধিকার ছিনিয়ে নিলে মুসলমান পুরুষ রুষ্ট হবে। তাদের হাতেই ভোটব্যাঙ্ক। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ঝামেলায় যাননি। মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের ক্ষতি হয় এমন কাজ তিনি কখনও করেন না। এবারও করেননি।

তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তাই নিয়ে বিজেপির কঠোর রাজনৈতিক অবস্থানে কোণঠাসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সহজে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। অপেক্ষা করেছেন তাঁর দোসর ইসলামি সংগঠনগুলি কী বলে তা জানার জন্য। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড (এ আই এম পি এল বি) এবং জামাত-উলেমা-ই-হিন্দ যখন বলল যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি তিন তালাক বন্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে তারা তার বিরোধিতা করবে এবং কিছুতেই বন্ধ করতে দেবে না তখন মমতা মুখ খুললেন। দুই ইসলামি সংগঠনের সিদ্ধান্তই হয়ে গেল তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। জামাত-উলেমা-ই- হিন্দের এক সমাবেশে তিনি পাঠালেন তাঁর দুই বিশ্বস্ত পার্শ্বচর পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং ফিরহাদ হাকিমকে। সেখানেই ঘোষিত হলো তিন তালাক নিয়ে মমতা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত।

অথচ তিন তালাক নিয়ে লোকসভার বিতর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস অংশগ্রহণ করেনি। এর কারণ সহজেই বোধগম্য। প্রথমত, মমতার মেন্টর মুসলমান নেতাদের মনোভাব তখনও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে মমতার রাজনীতির অভিমুখ আলাদা। রাজনীতিতে ন্যায়নীতির ধার তিনি কোনওদিনই ধারেন না। ঠিক যা করলে ভোটব্যাঙ্ক উপচে পড়বে মমতা তাই করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সারকথা হলো মুসলমানদের হাতে রাখো, তাহলেই তুমি ভোটের বৈতরণী পার হয়ে যাবে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট জিতেছিল মুসলমান ভোটের জোরে। ২০১১-তে মমতাও তাই। সুতরাং মুসলমানকে চটানোর সাহস মমতার যে হবে না, সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পশ্চিমবঙ্গের এই চিরাচরিত রাজনৈতিক কমফোর্ট জোনও ভেঙেচুরে ছত্রাখান।

মুসলমানদের প্রায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েরা কীভাবে বেঁচে থাকেন এতকাল কেউ তার খবর রাখেননি। সায়রা বানো, ইশরাত জাহান প্রমুখ মহিলার লড়াই খবরের শিরোনামে উঠে না এলে এবং সুপ্রিম কোর্ট এমন একটি যুগান্তকারী রায় না দিলে, বোধহয় কেউ কখনও জানার চেষ্টাও করতেন না। এখন সারা দেশে মুসলমান মহিলাদের সম্বন্ধে একটা সচেতনতা গড়ে উঠেছে। সবাই বুঝতে পারছেন দুনিয়ায় ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম নেই যেখানে বিবাহ বিচ্ছেদের মতো একটি সিরিয়াস বিষয়কে এমন ছেলেখেলার পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল জনমতের চাপে ভাগ হয়ে গেছে মুসলমান সমাজ। আতসকাচের নীচে ফেলে আলাদা করে দেখা হচ্ছে মুসলমান পুরুষ ও মহিলাকে। পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ মুসলমানের মধ্যে মহিলাও তো কম নয়। কিন্তু ভোটের অঙ্ক কষার ব্যাপারে মমতার জুড়ি মেলা ভার। তিনি জানেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান মহিলাদের বেশিরভাগই অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত। তাদের চালিকাশক্তি পুরুষরাই। এটাও সহজেই বোধগম্য, মধ্যযুগীয় মানসিকতার মুসলমান পুরুষের কাছে তালাক একটি লোভনীয় হাতিয়ার। তাই মেয়েদের বলির পাঁঠা বানাতে মমতা তিল মাত্র বিলম্ব করেননি। তার এই সিদ্ধান্তে মেয়েরা মরলেও ভোটব্যাঙ্ক বেঁচে গেছে। আপাতত এইটুকুই তাঁর লাভ। ■

তিন তালাক আন্দোলনে মোদী সরকারের ভূমিকা ‘ঐতিহাসিক’

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

কেন আমরা ‘তিন তালাক’ বা ইনস্ট্যান্ট ট্রিপিল তালাক বন্ধ করার জন্য আন্দোলন করেছি? মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষার এই আন্দোলনে নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকাই বা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? এ বিষয়ে আমি মার্কিন গৃহযুদ্ধের উদাহরণ টানতে ভালোবাসি।

হয়তো আমি নিজে ইতিহাসের ছাত্রী বলেই ইতিহাসের পাতা থেকে উদাহরণ টেনে আজকের মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষার এই সংগ্রামকে যথার্থতা দিতে চাই। আমেরিকান সিভিল ওয়ার বা আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের প্রদেশগুলি দাস প্রথার সমর্থনে ছিল। কিন্তু ১৮৬১ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন সে দেশে দাসদের বা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের দাস প্রথা থেকে মুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন দাসপ্রথা বিলোপকে একদিক থেকে নিজের জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। এবং সেই কারণেই দক্ষিণের প্রদেশগুলি যখন ‘কনফেডারেসি’ বা জোট তৈরি করে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন লিঙ্কনও পাল্টা যুদ্ধে যেতে দ্বিধা করেননি। এবং দক্ষিণের প্রদেশের নেতারা বা দাস প্রথার সমর্থকরা যখন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন যে তিনি এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছেন, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেই দায়কে অস্বীকারও করেননি। লিঙ্কনের বিখ্যাত উক্তি ছিল, হ্যাঁ, আমি যুদ্ধ ঘোষণা করছি। কারণ এই যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের স্বার্থে। এই যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যে সমতার নীতির কথা বলা হয়েছে, তার স্বার্থে।

আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট। সেদিনের আমেরিকার রাজনীতির নিরিখে কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন আর তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। আজ যাদের আমরা প্রগতিশীল বলে মনে করি, সেই ডেমোক্রাটরা কিন্তু সেদিন সময়ের দাবি অনুযায়ী প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এটাই ইতিহাসের অদ্ভুত মজা। আজ যে প্রগতিশীল, আগামীকাল সে তা নাও থাকতে পারে। গতকাল পর্যন্ত আমরা যাকে প্রগতিশীল বলে জানতাম, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সে হয়তো নিজেকে বদলাতে না পেরে থাকতে পারে।

এই তিন তালাক বা মুসলমান নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনে নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকার সঙ্গে আমি যেন কোথাও আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকার মিল খুঁজে পাই। লিঙ্কন আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের দাস প্রথা থেকে মুক্ত করবার জন্য সর্বস্ব পণ রেখেছিলেন। আর নরেন্দ্র মোদীও ভারতবর্ষের ১০ কোটি মুসলমান মহিলাকে অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী প্রথম মুসলমান মহিলাদের অধিকারের বিষয়টিকে যে তিনি এবং তাঁর সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে, সেই কথা উল্লেখ করেন। সেটা ২০১৬ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা। কিন্তু তারপর থেকেই মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন আলাদা গুরুত্ব এবং অবশ্যই গতিও পেয়ে যায়। এরপর থেকে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে একাধিকবার তিন তালাক এবং মুসলমান মহিলাদের অধিকারের বিষয়টিকে সামনে এনেছেন। এমনকী, ২০১৭ সালে স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতাতেও নরেন্দ্র মোদী তিন তালাক বন্ধ করার বিষয়টিকে উল্লেখ করেছিলেন।

যদি শুধু ভোটের স্বার্থেই হয়, তাহলেও বলতে হবে নরেন্দ্র মোদী যতবার মুসলমান মহিলাদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে সরব হয়েছেন, ভারতবর্ষের আর কোনও প্রধানমন্ত্রীই বোধহয় এই বিষয় নিয়ে মুখ খোলেননি। আর যদি আপনি ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকার তুলনা

করেন, তাহলে তো আপনাকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য সাধুবাদ দিতেই হবে। শাহবানু মামলার রায় বেরোনোর পরে মুসলমান কট্টরপন্থীদের চাপে রাজীব গান্ধী মুসলমান মহিলাদের খোরপোশের অধিকারকে বা সামগ্রিক ভাবে মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে একেবারে শেষ করে দিয়েছিলেন অর্ডিন্যান্স এনে। তাই আমাদের মতো মুসলমান মহিলাদের কাছে রাজীব গান্ধী যদি 'খলনায়ক' হন, তাহলে নরেন্দ্র মোদী অবশ্যই 'সুপার হিরো'।

যদিও এ লেখার বিষয় মূলত 'তিন তালাক' আন্দোলন, কিন্তু আমি যদি সামগ্রিকভাবে মুসলমান মহিলাদের অধিকারের বিষয়টিকেও পর্যালোচনা করি তাহলেও নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকারকে প্রশংসা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আমি সামগ্রিকভাবে মুসলমান মহিলাদের অধিকারের বিষয়টিকে আনলাম পুরুষ অভিভাবক বা 'মেহরাম' ছাড়া মুসলমান মহিলাদের বা ৪৫ ঊর্ধ্ব মুসলমান মহিলাদের হজে যাওয়ার যে অধিকার বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে। 'মেহেরাম' ছাড়া মুসলমান মহিলাদের এই হজে যাওয়ার অধিকার যে মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কত বড় জয়, তা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারবেন না। বিশেষত অ-মুসলমানদের পক্ষে সেটা বোঝা আরও কঠিন। আমি আমার গত ২০ বছরে মুসলমান মহিলাদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে এবং নিজের ৪৫ বছরের মুসলমান সমাজ জীবনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মোদী সরকারের এই দুটি সিদ্ধান্ত পুরুষতন্ত্রের মোকাবিলায় মুসলমান মহিলাদের অবস্থানকেই বদলে দিয়েছে। এবং দুটি ক্ষেত্রেই নরেন্দ্র মোদী ব্যক্তিগতভাবে সেই ভূমিকা পালন করেছেন, যা আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় আব্রাহাম লিঙ্কন করেছিলেন। একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তিনি ততটাই দিয়েছেন। যে 'মেহেরাম' ছাড়া মুসলমান মহিলাদের হজে যাওয়ার অধিকারকে আমি এত গুরুত্ব দিচ্ছি, মনে রাখবেন নরেন্দ্র মোদীও তাঁর ২০১৭-এর শেষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে সেই বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। কবে আপনি কোন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বার বার, এতবার, মুসলমান মহিলাদের অধিকার নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে দেখেছেন?

যদি আমি ভারতবর্ষের জনসংখ্যাকে ১২০ কোটির কাছাকাছি ধরি, তাহলে তার মধ্যে ২০ কোটির কাছাকাছি আমরা মুসলমানরা। এই ২০ কোটির মধ্যে অর্ধেক অবশ্যই মুসলমান নারী। যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য পরিষ্কার বলে রাখা ভালো আমাদের দেশের মুসলমান মহিলারা মোটেই সংবিধান অনুযায়ী সবকিছুর উপর সমান অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না। হ্যাঁ, সুপ্রিম কোর্ট 'তিন তালাক' নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পরও আমাদের দেশের মুসলমান মহিলাদের কাছে সংবিধানে বর্ণিত সব অধিকার পৌঁছায়নি। যেমন সম্পত্তির উপর মুসলমান মহিলাদের সমানাধিকার নেই। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকার অন্তত এইটুকু ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁরা মুসলমান মহিলাদের সমানাধিকার পাইয়ে দিতে আগ্রহী। সেই জন্যেই আমরা যখন সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে 'তিন তালাক' বা মুখের কথায় 'তিন তালাক' বন্ধ করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছি, তখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তরফে অ্যাটর্নি জেনারেলও সেই দাবির সপক্ষে দাঁড়িয়ে সওয়াল করেছেন।

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

আইন হলে মুসলমান পুরুষদের মধ্যে একটা 'ভয়' থাকবে, 'তিন তালাক' দিলে তাদের জন্য তিন বছরের কারাবাস অপেক্ষা করে আছে। কোনও 'ভয়' বা 'প্রতিষেধক শাস্তি'র বিধান না থাকলে আপনি মুসলমান সমাজ থেকে 'তিন তালাক'কে নির্মূল করবেন কীভাবে?

মোদী সরকার যখন সংসদে 'তিন তালাক' বন্ধ করার জন্য আইন আনলো, তখন সেই নিয়েও বিরোধীরা যথেষ্ট বাধা দিয়েছে। এবং বিরোধীদের বাধার জন্য রাজ্যসভায় 'তিন তালাক' বিল পাশ হতে পারেনি। 'তিন তালাক' বিলের যে বিষয়টি নিয়ে বামপন্থী এবং অন্য বিরোধীরা আপত্তি তুলেছেন, আমার সেটিকে অবান্তর মনে হয়। অর্থাৎ এই বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পরও যদি কোনও মুসলমান স্বামী তার স্ত্রীকে মুখের কথায় 'তিন তালাক' দেন, তাহলে তার জন্য তিন বছরের কারাবাসের শাস্তি হতে পারে। বিরোধীদের বক্তব্য, যদি মুসলমান পুরুষ জেলে চলে যায়, তাহলে ওই দম্পতির সন্তানদের দেখভাল কে করবে? অথবা তালাক প্রাপ্ত মহিলার খোরপোশ কে দেবে? যাঁরা বাস্তব জানেন, তাঁরা জানেন এমনিতেও ওই মহিলাকে কেউ আর্থিক সাহায্য দিতো না। আর তার সন্তানদেরও কেউ দেখতো না। অন্তত এই আইন হলে মুসলমান পুরুষদের মধ্যে একটা 'ভয়' থাকবে, 'তিন তালাক' দিলে তাদের জন্য তিন বছরের কারাবাস অপেক্ষা করে আছে। কোনও 'ভয়' বা 'প্রতিষেধক শাস্তি'র বিধান না থাকলে আপনি মুসলমান সমাজ থেকে 'তিন তালাক'কে নির্মূল করবেন কীভাবে?

তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিয়ে সারা দেশ থেকে যে ক'জন মুসলমান মহিলা প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ইশরাত জাহান অন্যতম। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাদের জয় হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এক যুগান্তকারী রায়ে তাৎক্ষণিক তিন তালাককে বেআইনি ঘোষণা করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মফস্‌সলের স্বল্পশিক্ষিত এই মুসলমান তরুণীর সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ইসলামি ধর্মতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করা অলীক রূপকথার মতো মনে হতে পারে। সত্যিই তিনি আজ রূপকথার নায়িকা। স্বস্তিকার প্রতিনিধির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি সেই রূপকথার রাক্ষস-খোক্কসদের সন্ধান দিয়েছেন। কথায় কথায় তিনি জানালেন...

বাড়িতে ছেলের সঙ্গে ইশরাত।

‘মোল্লা-মৌলবিদের জন্য মুসলমান মহিলাদের এই দুর্দশা’

☐ তিন তালাক ইস্যুকে কীভাবে দেখবেন, ইসলামিক ইস্যু নাকি মেয়েদের ইস্যু?

● অবশ্যই মেয়েদের ইস্যু। সারা দেশ তাই বলছে। এবং তাই বলবেও। আসলে আমাদের সমাজে (মুসলমান সমাজে) কিছু মানুষ আছেন যারা স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে মুখ খুললেই ‘ইসলাম আক্রান্ত’ বলে আওয়াজ তোলেন। এটা একটা অসুখ। (হেসে) আমার এরকম অসুখ নেই।

☐ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে তাৎক্ষণিক তিন তালাক বেআইনি। এই রায়ের নেপথ্যে রয়েছেন আপনার মতো বেশ কয়েকজন সাহসী মহিলা। কীভাবে শুরু হলো এই লড়াই?

● সে তো একটা বিরাট গল্প। আমার স্বামী (প্রাক্তন) দুবাইতে থাকে। এমব্রয়ডারির কাজ করে। পরপর তিনটি মেয়ে হওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমার ওপর অত্যাচার করত। সে যে কী অত্যাচার আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

☐ মারধর করত?

● মারতে মারতে বাড়ি থেকে বের করে দিত। খেতে দিত না। দিনের পর দিন এইভাবে থাকতে থাকতে আমি ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম। সারাদিন একটা দ্বিধায় ভুগতাম। আমার কী করা উচিত? আব্বু-আম্মি আমার সাপোর্টে ছিলেন।... মনে হোত এই অন্যায়ের একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কিন্তু মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে ডিসিশন নিতে পারতাম না। যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়! যদি আর কখনও ফিরতে না পারি?

☐ তারপর—

● ২০১৩-য় আমার ছেলের জন্ম হয়। যদিও তাতে লাভ কিছু হয়নি। আমার ওপর অত্যাচার তাতে বিন্দুমাত্র কমেনি।

☐ আপনি বলছেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আপনার ওপর অত্যাচার করত। তাদের মধ্যে কি আপনার প্রাক্তন স্বামীও ছিলেন?

● অবশ্যই। তার নির্দেশেই তো সব হোত। ওই লোকটার জন্যেই আমার ঘরের লাইট কেটে দেওয়া হয়েছিল। হাতে টাকা-পয়সা দেওয়া তো দূর, খেতেও দিত না। আমি সেলাই করে নিজের খরচ চালাতাম।

☐ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা কবে ভাবলেন?

● ২০১৪ সালে। ওই বছর আমি শ্বশুরবাড়ির লোকেদের (প্রাক্তন

স্বামী-সহ) বিরুদ্ধে ৪৯৮ ধারায় কমপ্লেন করি। আব্বু-আম্মি আমাকে সাহস জুগিয়েছেন। ২০১৫ সালে আমার এক্স-হাজব্যান্ড দুবাই থেকে ফোন করে আমায় তালাক দেয়। ...ফোনটা পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম এভাবে তালাক হয়। ফেসবুকে টুইটারে—এমনকী টুকরো কাগজে তিনবার তালাক লিখে তালাক দেওয়া হয়। কিন্তু আমার জীবনে এরকম হবে কখনও ভাবিনি। তবে আমি ভেঙে পড়িনি। ২০১৫ সালে হাওড়া কোর্টের রায় শোনার পর আমি সুপ্রিম কোর্টে যাব বলে মনস্থ করি। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্টে আমার অভিযোগ নথিভুক্ত হয়। তারপর একটানা এক বছরের লড়াই। তাই রায় ঘোষণার পর আমার প্রথম অনুভূতি ছিল মুক্তির। মনে হচ্ছিল যেন নতুন জন্ম হলো আমার।

☐ আপনার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়েছিল। প্রাণান্তকর চাপ সৃষ্টি করেছিল মোল্লা-মৌলবিরা। আপনার ভয় করেনি?

● যুদ্ধে নেমে পড়ার পর আমি ভয় পাইনি। জানতাম আমি কোনও অন্যায় করছি না। উল্টে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমরা যদি সফল হই তা হলে মুসলমান সমাজের অনেক মহিলা উপকৃত হবেন। অনেকে অনেক কিছু করেছে। অনেক কথা বলেছে। দিনের পর দিন থ্রেট কল এসেছে। কিন্তু আমি ভয় পাইনি।

☐ ইসলাম সম্বন্ধে বলা হয় এই ধর্মে নারী-পুরুষে কোনও বৈষম্য নেই। আপনার অভিজ্ঞতা কী বলে?

● একটা কথা বলি, কোরানের চোখে নারীপুরুষ সমান। পুরুষকে সুবিধে দেওয়ার কথা কোরানে নেই। মুসলমান মহিলাদের দুর্দশা মোল্লা-মৌলবিদের জন্য।

☐ কিন্তু কোরান যা বলে আর বাস্তবে যা হয় তার মধ্যে তো আকাশ পাতাল পার্থক্য। আপনার কি মনে হয় না মুসলমান পুরুষের মানসিকতা এখনও অনেকাংশে মধ্যযুগীয়?

● অবশ্যই। কিন্তু তার জন্য দায়ী শিক্ষার অভাব। মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। নয়তো ওই মধ্যযুগ কোনওদিনই শেষ হবে না।

☐ এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ। তিন তালাক ছাড়াও ইসলামি আইনে আরও কিছু তালাকের প্রথা আছে। সেসব ক্ষেত্রেও কি স্বামীর সম্পত্তিতে তালাকপ্রাপ্ত মহিলার কোনও অধিকার নেই?

● (মাথা নীচু করে) না।

☐ তালাকের পর কোনও এককালীন ক্ষতিপূরণ?

● দেন মোহরের পর তিন মাস তেরো দিনের খরচ দেয়। তারপর আর কিছু না।

> **বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা প্রথম থেকে আমার পাশে ছিল। তাছাড়া আমি মনে করি বিজেপি মুসলমানদের ক্ষতি করবে না। বাকিরা মুসলমানদের ব্যবহার করে ভোটে জিতবে কিন্তু তারপর ফিরেও দেখবে না। তাই আমার বিজেপিতে যোগদান।**
>
> **—ইশরাত জাহান**

☐ আপনাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তাই জিজ্ঞাসা করছি। সাধারণ মানুষের একটা ধারণা আছে কোনও মুসলমান ব্যক্তি একা হলে তার মতো ভালোমানুষ আর কেউ হয় না। কিন্তু দলবদ্ধ অবস্থায় তিনিই সাংঘাতিক। মানেন?

● মানি। একা মানুষ তার নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী চলে। কিন্তু দলে পড়লে দলই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরা সত্যিই খুব সাংঘাতিক।

☐ আর একটা কথা। অনেকেই বলেন অশিক্ষিত মুসলমানের তুলনায় শিক্ষিত মুসলমান বেশি সাম্প্রদায়িক। মানেন?

● মানি। শিক্ষিত মুসলমানেরা মাঝে মাঝে এমন অনেক কথা বলেন যা হয়তো সমাজের পক্ষে ততটা মঙ্গলজনক নয়। যেমন—

☐ যেমন?

● কোথায় যেন পড়েছিলাম, শাবানা আজমি বলেছেন তিন তালাক বিল পাশ হলে মুসলমান মহিলাদের তেমন কোনও উপকার হবে না।

☐ কথাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন।

● হ্যাঁ। আমার প্রশ্ন, মুসলমান মহিলারা এখন কী এমন ভালো অবস্থায় আছেন? যারা নরেন্দ্র মোদীর চেষ্টার সমালোচনা করছেন তারা কি জানেন সারা ভারতে কত লক্ষ তালাকপ্রাপ্ত মুসলমান মহিলা স্রেফ পরের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে বেঁচে আছেন? এরা অধিকাংশই তিন তালাকের শিকার।

☐ আপনার কি মনে হয় তিন তালাক বিল পাশ হলে মুসলমান মেয়েদের ভালো হবে?

● অবশ্যই হবে। শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার হলে মেয়েরা ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারবে, এটা কম কথা নাকি? মুসলমান মেয়েরা মোদীজীর জন্য দুয়া করবে, দেখে নেবেন। ■

এই সময়

শীতল পৃথিবী

সাইবেরিয়ার ওইমেকন। পৃথিবীর মধ্যে শীতলতম অঞ্চল। কেমন ঠাণ্ডা সেখানে? চোখের পাতায় বরফকুচি জমছে এই শহরে। থার্মোমিটার ভেঙে যাচ্ছে বলে খবর। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখনও পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস বাষট্টি ডিগ্রি। ভাবা যায়!

ভূতছবি

ঘটনাটা নিঃসন্দেহে ইন্টারনেটের হল অব ফেমে জায়গা পাওয়ার মতো। পারিবারিক অ্যালবামে রাখার জন্য আমেরিকার মিসৌরি শহরের জেরিং পরিবার ছবি তুলিয়েছিলেন। কিন্তু আলোকচিত্রীর ভুলে ছবির প্রতিটি মানুষের মুখ হয়ে দাঁড়াল হরর সিনেমার ভূতের মতো। এমন মুখ যা দেখলেই ভয় করে।

বিমানকারি

হোম সার্ভিসে ফোন করলে অনেক সময়ই উত্তর আসে, অত দূরে আমাদের সার্ভিস নেই।

ফ্রান্সের বাসিন্দা এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক এসবের তোয়াক্কা করেন না। খেতে ভালোবাসেন তাই ব্রিটেনের আকাশ রেস্তোঁরার চিকেন ফাউল কারি অর্ডার করেছিলেন। কারি তার কাছে পৌঁছল বিমানে।

সমাবেশ -সমাচার

বারাসতে সংস্কৃত সম্মেলন

গত ৭ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃত সম্মেলন। উপস্থিত অতিথিদের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়। দীপস্তুতি পাঠ করেন অধ্যাপক অভিজিৎ ভট্টাচার্য। মঙ্গলাচরণ রূপে সামগান প্রস্তুত করেন অধ্যাপক সৌগত মুখোপাধ্যায়। আবিরলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শিবপঞ্চাক্ষর স্তোত্রের পাঠ সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। সম্মেলনের প্রয়োজনের কথা বলেন সত্যানন্দম্ সংস্কৃত পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিপদভঞ্জন পাল তাঁর ভাষণে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল প্রসারের কথা বলেন। সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারে সংস্কৃতভারতীর বিশিষ্ট ভূমিকার কথা তুলে ধরেন সংস্কৃতভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক স্বপন বিশ্বাস। বারাসত যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুসিদ্ধানন্দ সরস্বতী আশীর্বচন প্রদান করেন। শ্রীরামবিটঠলবিরচিত, অরিজিৎ গুপ্ত কর্তৃক নির্দেশিত ‘বঞ্চকঃ শৃগালঃ’ নামক হাস্যরসাশ্রিত নাটকে উজ্জ্বল, প্রশান্ত, দেবাংশু প্রমুখ কুশীলবের ভূমিকা সকলকে আনন্দমুখরিত করে তোলে। সমিতির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ রায় প্রতিবেদন পেশ করার পরে সম্পাদক অধ্যাপক প্রশান্ত দে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কার্যক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দের উপস্থিতি কার্যকর্তাদের উৎসাহিত করে। কার্যক্রমে সংস্কৃত প্রদর্শনী এবং পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্রও ছিল।

মালদার সামসীতে পরিবার প্রবোধন সম্মেলনে বনভোজন

গত ৭ জানুয়ারি মালদা জেলার সামসী অখিলেশ্বর দাস সরস্বতী শিশু মন্দিরে পরিবার প্রবোধনের সম্মেলন সহ-বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজনে ১০০টি পরিবারের ৪৮ জন দম্পতি ও তাদের ছেলেমেয়ে সহ মোট ১৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। এদিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় শিশু মন্দিরের প্রভাত বিভাগের আচার্য প্রমুখ বিপ্রাঞ্জলি রায় এবং অতিথির আসন অলংকৃত করে সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য সহায়িকা শ্রীমতী শিপ্রা দাস রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদা জেলা সহ-কার্যবাহ শুভাশিস প্রামাণিক ও প্রচারক মৃণালকান্তি সিংহ।

এই সময়

জানদার

কথায় বলে একজায়গায় দু'বার বাজ পড়ে না। বাজের ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি হলেও গাড়ির ক্ষেত্রে নয়। চীনের এক মহিলা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে একই গাড়ির নীচে দু'বার চাপা পড়েছেন। সব থেকে বড়ো কথা তারপরেও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

খুদে সাংবাদিক

বয়েস মোটে এগারো। কিন্তু এই বয়েসেই বাচ্চা মেয়েটির সাধ সাংবাদিক হবার। সে তার ইচ্ছের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার সম্পাদককে। সম্পাদক তাকে নিরাশ করেননি। প্রাপ্তি স্বীকার করে উত্তর দিয়েছেন।

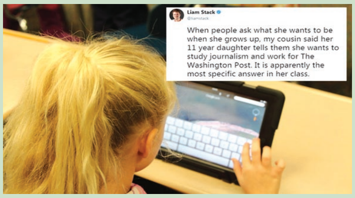

Liam Stack
@liamstack

When people ask what she wants to be when she grows up, my cousin said her 11 year daughter tells them she wants to study journalism and work for The Washington Post. It is apparently the most specific answer in her class.

রেলে বলিউড

সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতীয় রেল বলিউডের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

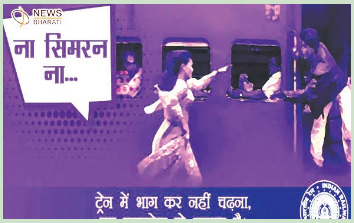

যাত্রী নিরাপত্তা সম্পর্কিত যে নতুন পোস্টার রেল প্রকাশ করেছে তাতে রয়েছে জনপ্রিয় হিন্দি ছবি দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে ছবির একটি দৃশ্য।

সমাবেশ -সমাচার

মালদহে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শীতবস্ত্র প্রদান

গত ৩ জানুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে পুরাতন মালদহ ব্লকের ভাবুক অঞ্চলের আটমাইল, রায়গ্রাম ও মালদীঘি গ্রামে ১৫০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে কম্বল প্রদান করা হয়।

জয় শ্রীরাম
জয় শ্রীরাম
হিন্দু পরিষদ

বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি মলয় মুখার্জী, জেলা সম্পাদক গোপাল কুণ্ডু ও বিভাগ সংগঠন সম্পাদক মন্টু সরকার, জেলা ধর্মজাগরণ প্রমুখ মন্টু সরকার, বজরঙ্গ দলের সংযোজক সুরজিৎ গুহ প্রমুখ।

দুর্গাপুর সেবা বিভাগের পারিবারিক বনভোজন

গত ৩১ ডিসেম্বর দুর্গাপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বনভোজনের আয়োজন করা হয় দুর্গাপুরের ইছাপুর সংলগ্ন বনবাসী ক্ষেত্র রাখাবন্দে। বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের পরিবার এবং সেবা সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের মোট ৪৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে বনভোজনের কার্যক্রম হয়। উপস্থিত ছিলেন বলরাম হালদার, বর্ধমান বিভাগ সঙ্ঘচালক ড. কমল ভট্টাচার্য, আসানসোল জেলা সঙ্ঘচালক নিরঞ্জন মাকুড় প্রমুখ।

পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে সংবর্ধনা

গত ২১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলায় পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে সহস্র পূর্ণ চন্দ্র দর্শনকারী বর্ধমান বিভাগ সেবা প্রমুখ সুব্রত সামন্তর পিতা হলধর সামন্তকে সম্মানিত করা হয়। শতাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে সংগঠনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র তাঁর বক্তব্যে সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। সভায় সভাপতি ছিলেন পাশিটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক অমর সরকার।

এই সময়

শিরোপা সাহসে

আঠারোজন ছেলেমেয়েকে সাহসিকতার জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হলো। এদের জন্য বহু মানুষের প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। আঠারোজনের মধ্যে রয়েছে সাতজন মেয়ে। ভারত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের নাজিয়াকে। জুয়ার ঠেকের মালিকদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহে সে পুলিশকে সাহায্য করেছে।

ভ্যাকসিটেক

সারা পৃথিবীতে ফ্লু এখন অনেক মানুষের আতঙ্কের কারণ। মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা আরও বাড়াবার জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন। সম্প্রতি সেই চেষ্টার সুফল পাওয়া গেছে। ভ্যাকসিটেক নামের একটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, ফ্লু সারাতে তার জুড়ি মেলা ভার।

NEWS BHARATI

মোশে হোল্টজবার্গ

ভারত সফরে এসে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেয়াহু নরিম্যান হাউজে মুম্বই বিস্ফোরণে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন। তাদের মধ্যে ছিল এগারো বছরের মোশে হোল্টজবার্গ। বিস্ফোরণে তার বাবা-মা দু'জনেই মারা যান। নেতানেয়াহু অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেন।

সমাবেশ -সমাচার

আঁটিসাড়ায় ফল চাষের প্রশিক্ষণ

গত ২৭ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে সালিদহ অঞ্চলের আঁটিসাড়া গ্রামে ফল চাষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞানীরা। চাষিদের মধ্যে এমনিতেই বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদের রেওয়াজ আছে। গ্রামবাসী উদ্যান ফসল চাষ করে বেশি লাভ করতে চান। তাই চাষ থেকে বেশি লাভ পেতে এবং চাষের কাজে সহযোগী হতে গ্রামের মহিলাদেরও উৎসাহী হতে দেখা গেল। নারী-পুরুষ মিলিয়ে ১০০ জন চাষি অংশগ্রহণ করেন কৃষি আলোচনা সভায়। উন্নত পদ্ধতিতে আম চাষ নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী; কলা চাষ নিয়ে আলোচনা করেন ড. দিলীপ কুমার মিশ্র এবং ফলের লাভজনক বাগিচায় সাথী-ফসল ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চাষিদের পরামর্শ দেন ড. দেবলীনা মাঝি। গবেষক দেবাশিস রাণা ও কৃষি সাংবাদিক জয়তি দে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় ড. কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, বারোমাসি বা দোফলা আমগাছ উচ্চ ঘনত্বের দ্বি-বেড়া সারি পদ্ধতিতে লাগিয়ে লাভ বেশি পাওয়া যাবে। সাধারণ ভাবে আমগাছ ১০ মিটার × ১০ মিটার দূরত্বে লাগানো হয়। দ্বি-বেড়া সারিতে ৫ মিটার সারি দূরত্বে এবং সারিতে ৫ মিটার গাছ-দূরত্বে চারা লাগানো হয়। মাঝে ১০ মিটার ফাঁক দিয়ে আবার দ্বি-বেড়ায় ৫ × ৫ মিটার দূরত্বে দুটি সারিতে গাছ লাগানো হয়। এই ভাবে গাছের সংখ্যা হেক্টরে ১০০ থেকে বেড়ে হয়ে যায় ২২২টি। গাছের সংখ্যা বাড়ায় মোট ফলনও বাড়ে। অন্যান্য জাতের মধ্যে তিনি আম্রপালি মল্লিকা সংকর জাত দুটি সুপারিশ করেন। ডাল কেটে, পরিচর্যা করে পুরনো আমবাগান কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় তা নিয়েও আলোচনা করেন। আমবাগান থেকে নিয়মিত ফলন পেতে মাটিতে নির্দিষ্ট মাত্রায় প্যাক্লোবিউট্রাজোল হর্মোন প্রয়োগের সুপারিশ করেন। আমের শোষকপোকা এবং গুঁড়োচিতি রোগ সমেত নানান সমস্যার সমাধানের কথা বলেন।

ড. দিলীপ কুমার মিশ্র সচিত্র পোস্টার প্রদর্শন করে কলার নানান উন্নত জাত, চাষ পদ্ধতি, রোগ-পোকার সমস্যা ও তার মোকাবিলা টিস্যু কালচার কলার চারা কেন ভালো, সেকথা আলোচনা করেন। কলা থেকে নানান প্রক্রিয়াকৃত খাবার তৈরির কথা আলোচনা হয় যার প্রতি মহিলাদের আগ্রহ ছিল। কলার তন্তু থেকে কীভাবে বস্ত্র বয়ন হতে পারে সে প্রসঙ্গও ছিল। ড. দেবলীনা মাঝির বক্তব্যে মিশ্র ফল চাষের ধারণা কৃষকেরা মন দিয়ে শুনেছেন। কেন মাঠের ফসল চাষ না করে উদ্যান ফসল চাষ করতে হবে তা বুঝিয়ে বলেন। কৃষকেরা নিয়মিত চাষের তথ্য পাবার আগ্রহ দেখালে উপস্থিত কৃষকদের 'ফার্মলোর' হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের সন্ধান দেন গবেষক দেবাশিস রাণা। আলোচনা সভায় কৃষকেরা নিজেদের কিছু প্রশ্ন তুলে ধরলে তার উত্তর দেওয়া হয়। কৃষকদের মধ্যে বিজ্ঞানীদের চলভাষ নম্বর নেবার আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

অতিথি কলম

ভারতের বিদেশ নীতির চালিকাশক্তি জাতীয়তা ও মানবতার সংমিশ্রণ

এম জে আকবর

একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলন কী হবে তারই ফলিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় সে দেশের বিদেশ নীতির রূপায়ণে। আকাঙ্ক্ষা বস্তুটি কখনই স্থবির নয়, তা সবসময়ই গতিশীল থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতির অবস্থান নির্ধারণ করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবাসী মনস্থ করে তারা আর বিদেশি প্রভুর দাসত্ব মেনে নেবে না। ফলত আবির্ভাব হয় মহাত্মা গান্ধীর মতো এক নেতার। জনতা তাঁর মধ্যে নিজেদের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। তিনি ভারতবাসীর এই স্বাধীনতার দাবিকে পুঁজি করে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হয়। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভারত ও গান্ধী নতুনভাবে শুরু করেন ইতিহাসের গতিমুখ। ওই শতাব্দীরই দ্বিতীয়ার্ধে পরাজিত ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের অগ্রগতির বিরুদ্ধে অর্ন্তঘাত চালাতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। কিন্তু বিজয়ী হয় ভারত। যদিও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেশ পিছিয়ে পড়ে, যার মূল কারণ ছিল ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষীদের কার্যকলাপ। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দী এক অন্য ঠাঁই। ভারত তার অর্থনীতি পরিচালনার কম্পাসটিকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিয়েছে। একই সঙ্গে সে যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতাও অর্জন করেছে। যার ফলশ্রুতিতে একুশ শতাব্দীর অগ্রণী দেশগুলির তালিকায় সে প্রথম সারিতে থাকার ন্যায্য অধিকারের দাবিদার। এই নতুন পথনির্দেশিকা তৈরির ক্ষেত্রে বিদেশ নীতির একটি নির্ণায়ক ভূমিকা থেকে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশ নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে তার সেই কাঙ্ক্ষিত নেতাকে খুঁজে পেয়েছে যিনি এই পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট আকার দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাবশালী ভূমিকা গ্রহণ করার ভিত্তি স্থাপন করার যোগ্য। মোদীর বিদেশ নীতির মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন যা সর্বদাই ভারতের মৌলিক প্রাচীন দর্শনের অনুসারী। এই দৃষ্টিভঙ্গি হলো— 'সারা বিশ্বই একটি পরিবার' (বসুধৈব কুটুম্বকম্)। আমাদের দেশের বরাবরের গণতান্ত্রিক ভাবসত্তার সঙ্গে যে বিশ্বাস বা দৃষ্টিকোণ সুন্দরভাবে মিলে যায়।

সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গা নিয়েছে জাতি-রাষ্ট্র (Nation State)। এর মূলে ছিল অগণিত মানুষের জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং তা আদপেই হাতে গোনা এলিট বা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিপ্রায় নয়। তাই নিশ্চত করে বলা যায় যে জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদ গণতান্ত্রিক মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আর দুটির যুগ্ম প্রভাবই চালিত করছে মোদীর বিদেশনীতিকে। বর্তমান বিশ্বে জাতিগুলিকে আর বড় ছোট এমন বিভাজনে ধরে রাখা যায় না। তারা সকলেই সার্বভৌম, সমান ও একই অধিকারভোগী। অবশ্যই তাদের যেমন সমান অধিকার রয়েছে তেমনই রয়েছে সমান দায়বদ্ধতা। মোদীজীর বিদেশ নীতি পরিচালনার মূল রসদ হচ্ছে— (১) যৌথ সমৃদ্ধিতে সফল জাতির বিশ্বাস, (২) যৌথ নিরাপত্তার বাতাবরণ আর তার নিশ্চয়তা, (৩) সন্ত্রাসবাদের আমূল উৎপাটন, (৪) বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে বিশ্বমানবের জীবনযাত্রায় গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিদেশ নীতির অভিমুখ রূপায়ণে আন্তরিক ইচ্ছার প্রমাণ রাখতে ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিকটতম প্রতিবেশী দেশে ২০১৪ সালের মে মাসেই যাত্রা করেছিলেন।

তারপর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘকালীন সীমান্ত বিরোধ ও কাঁটাতার লাগানোর সমস্যা সমাধানে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে এগিয়ে যান। যে সম্পর্ক অতীতে আবদ্ধ বা ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল তা দ্বিপাক্ষিক সফর ও বিভিন্ন প্রকল্পে যৌথ যোগদানের মাধ্যমে অনেকটাই সচল করে তুলেছেন তিনি। মানবিকতার যে প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রতিবেশী নেপালের আকস্মিক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বিপুল সাহায্য নিয়ে ভারতের এগিয়ে যাওয়ার

> “বেঁচে থাকার অধিকার যদি প্রত্যেক মানুষের প্রথম মৌলিক অধিকার হয় সেক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ যা মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে তাই হচ্ছে এর অ্যান্টি থিসিস অর্থাৎ মানবাধিকারের প্রধান শত্রু।”

ঘটনায়। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা বিপন্নের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে ভারতের বিপুল বিনিয়োগ একটি বিরলদৃষ্ট পদক্ষেপ। আজকের আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্যে ৩১টি প্রদেশেই ভারতীয় সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলেছে। আফ্রিকায় ভারত ১০ বিলিয়ন ডলারের একটি বড় টাকা সঞ্চিত ফান্ড হিসেবে রেখেছে যা থেকে জনহিতকর পরিকল্পনাগুলি চালানো যায়। ফ্রান্সের সঙ্গে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পে ২ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্পও মানবহিতেই রূপায়িত হচ্ছে।

বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদকেই নরেন্দ্র মোদী সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ বলে চিহ্নিত করেছেন। দীর্ঘস্থায়ী ও একনাগাড়ে লেগে থাকা কূটনৈতিক দৌত্যের ফলে বিশ্বের সেই সমস্ত দেশ যারা এযাবৎকাল রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের খাতিরে বহু সন্ত্রাসবাদী দেশকে মদত দিত, তাদের সংগঠন ও নাম আজ বিশ্বের সর্বোচ্চ ফোরামে আলোচিত হচ্ছে। তারা এখন খোলাখুলি আতঙ্কবাদের নিন্দা করছে, এটা বড় কম সাফল্য নয়। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে লাগাতার সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়ার কারণে শান্তি প্রক্রিয়াও যেকোনও দ্বিপাক্ষিক মঙ্গলজনক প্রকল্পে কিছুতেই অগ্রসর হওয়া যায়নি। বেঁচে থাকার অধিকার যদি প্রত্যেক মানুষের প্রথম মৌলিক অধিকার হয় সেক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ যা মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে তাই হচ্ছে এর অ্যান্টি থিসিস অর্থাৎ মানবাধিকারের প্রধান শত্রু।

মোদী সন্ত্রাসবাদকে দুটি কারণে মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্নকারী বলে বর্ণনা করেছেন। সন্ত্রাসবাদীরা জাতি-রাষ্ট্রের সংজ্ঞাটিকেই অস্বীকার করে ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক বিশ্ব স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর। তারা নির্দিষ্ট কোনও বিশ্বাসেরই প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সকল বিশ্বাসের সমান অধিকার তারা কখনই চায় না। তারা রাষ্ট্রগুলিতে ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক খলিফার রাজত্ব কায়েম করতে চায়। এই বিশ্বাসের আধিপত্যকে মেনে নিলেই এর অনুষঙ্গ হিসেবে আসবে নারীর ওপর নির্যাতন, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও চিরকালীনভাবে অগ্রসরমান চরমপন্থার দাপট।

মোদীর অবস্থানের ওপর প্রায় সারা বিশ্বের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমর্থন একত্রিত হয় যখন তিনি সীমান্তপারের সন্ত্রাস ঠেকাতে এল ও সি (লাইন অব কন্ট্রোল) অতিক্রম করে পাকিস্তানে গিয়ে সার্জিকাল স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নেন। নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গ আলোচনায় কিছু কিছু দেশ বিস্ময় প্রকাশ করে— এমনটা আগে কেন হয়নি। আরব দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো এই সূত্রে একটি বড় উদাহরণ। মোদী একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি ৩৫ বছর পর প্রথম ইউ এ ই-তে সফর করেন। ফলশ্রুতিতে ইউ এ ই আজ আন্তর্জাতিক স্তরে এক কৌশলগত বড় সঙ্গী এবং একই সঙ্গে ভারতে বড় মাপের বিনিয়োগকারী। আরবের সঙ্গে এই সম্পর্ক উন্নয়নে মোদীর কঠিনতম শত্রুও অবাক হয়ে দেখেছে সেদেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, মোদী সৌদি আরব ও ইউ এ ই-এর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করলেও তাদের বিরোধী দেশ ইরানের সঙ্গে আমাদের চিরাচরিত সুসম্পর্কে কোনও দাগ পড়েনি। চীন-পাক যৌথ উদ্যোগে তৈরি গোয়াদর বন্দরের কাছেই ভারত-ইরান যৌথ উদ্যোগে চাবাহর বন্দরের নির্মাণ-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতের ন্যায্য স্বার্থ সুরক্ষায় যে সক্ষম এই বিষয়টা আজ বিশ্বে সম্ভ্রম পাচ্ছে। সাম্প্রতিক ডোকালাম সীমান্তে চীনা পি এল এ (পিপল লিবারেশন আর্মি) সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের দীর্ঘকালীন চোখে চোখ রেখে অবস্থান ভারতকে এক ঠাণ্ডা মাথার কূটনৈতিকতায় পারদর্শী দেশ হিসেবে তুলে এনেছে। যুদ্ধাঙ্গনেও যে কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসী থাকা যায় ভারতের এই অবস্থান বিশ্ববাসীর কাছে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

আজ ভারত ও চীন উভয়েই বুঝতে পারছে পারস্পরিক দীর্ঘশত্রুতা বজায় রাখার থেকে সুসম্পর্ক গড়ার মধ্যে অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে। বর্তমান সরকার মতপার্থক্যকে কখনই বিতর্কিত পরিস্থিতি হতে দেয়নি। ফলে বিতর্কিত পরিস্থিতি কখনই বৃদ্ধি পেয়ে সংঘর্ষের পথে এগোয়নি। ২০১১ সালের নভেম্বরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি একবার চীন সফর করেছিলেন। সেই সময় আশা করা গিয়েছিল যে তিনি অরুণাচল সংক্রান্ত সমস্যা, পাক অধিকৃত কাশ্মীর, জঙ্গি শিবিরের অবস্থান বা বিনিয়োগ নিয়ে নিশ্চিত আলোচনা করবেন। কিন্তু তাঁর অগ্রাধিকারের সূচিতে প্রথমেই ছিল ২২ জন ভারতীয়ের চীনা জেলে বন্দি থাকার বিষয়টি। সফরের কিছু পরে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। তাই আবারও বলছি, মোদীর নেতৃত্বে মানবিকতার দিকটি দেশের বিদেশনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ করছে।■

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
uti UTI Mutual Fund
HDFC MUTUAL FUND
SBI MUTUAL FUND A partner for life.

চিঠিপত্র

রেশন বণ্টনে বৈষম্য

রাজ্যের খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'চার কথা। রাজ্যের জনগণের সঙ্গে তঞ্চকতা করে চাল, গম, আটা, চিনি, কেরোসিন তেলের বিলিব্যবস্থা কোন শাসকের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত কে জানে?

প্রথমত, যেভাবে কার্ডের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে জনগণের চোখে তা স্বজনপোষণের নামান্তর। ২০/২৫ হাজার বা ততোধিক রোজগার যাদের তাদের মধ্যে অনেকেই পেয়েছে প্যানকার্ডের মতো ছোটকার্ড, মানে তারা পাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ রেশন। যারা কম অনুগৃহীত তাদের কার্ডের সাইজ মাঝারি; নাগরিক হিসেবে তাদেরও বরাদ্দ ভালই। আর পুরাতন আমলের কার্ড যাদের তারা ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মতো। ২ মাসে যদি চারবার রেশন দেওয়া হয় এই তৃতীয় বাচ্চারা যে পরিমাণ কেরোসিন পায় তাতে সেই তেল ছয়বার জমালেও কোনও কাজ করা যাবে না।

কারখানা আছে, ৩০ হাজার টাকার ওপর মাইনে পায়, অবসরপ্রাপ্ত ২০ হাজারের উপর পেনসন যাদের আর শাসকদলের পার্টি অফিসের অনুগৃহীত যারা আর নিকট বন্ধু বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে, তারা প্রতিবার রেশন পায় মান্ধাতা আমলের কার্ড হোল্ডারদের থেকে তিনগুণ বেশি।

কার্ডের পুনর্বিন্যাস হওয়ার বেশ কয়েকমাস পরে পার্টির ওয়ার্ড অফিস মারফত খবর অনেকে পেল, অনেকে পেল না। প্রশ্ন, কার্ড কেন শাসকশ্রেণীর ক্যাডার মারফত বিলি হবে? কেন রেশন ডিলার মারফত হবে না? তাহলে তো জনগণের মনে, একটা যে দুর্নীতির সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা হতো না। যারা লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করে তারাও অনেকে নতুন কার্ড পায়নি। ফলে রেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা ব্রাত্য।

রেশনের জন্য নতুন কার্ডের ক্ষেত্রে আর পুরাতন কার্ডের রেশন দ্রব্যের মূল্যের ক্ষেত্রে বিমাতৃসুলভ মনোভাব কেন? Non NFSA or RKSY —এটা পুরাতন কার্ড, এরা কিছুই পায় না। RKSY-I এদের দেয় গম ২ টাকা কেজি দরে আর চাল ২ টাকা কেজি, RKSY-II এরা চাল পায় ১৩ টাকা কেজি ও গম ৯ টাকা কেজি দরে। এই বৈষম্য কেন?

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পুরাতন কার্ডধারীদের জন্য বরাদ্দ চালগম ব্যবসায়ীর গোডাউনে মজুত আছে কিন্তু তাদের দেবার কোনও অর্ডার নেই। রেশনদ্রব্য বণ্টনের নামে এদের সঙ্গে হঠকারিতা কেন? জানি না জবাবটা কার কাছে চাইব, রাজ্য সরকার না কেন্দ্রীয় সরকার? সুষম বণ্টনব্যবস্থা ও কার্ড পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনও দুর্নীতি যাতে না হয় তার জন্য স্থানীয় পৌরপ্রধানের অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর অন্ত্যোদয় যোজনায় যারা রেশন পাচ্ছে তাদের চাল গমও ২ টাকা কেজি দরে। বাকি RSKY, RSKY-I, RSKY-II-এর যাবতীয় দাম ও বণ্টনব্যবস্থা করে থাকে রাজ্যসরকার। আমরা অনেকেই জানি রেশন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করে থাকে, তাই আমরা গোডাউনে গম চাল থাকা সত্ত্বেও পাওয়া না গেলে কেন্দ্রের দোষ দিই। ব্যাপারটি কিন্তু রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। পুরানো কার্ডধারীদের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ তাদেরও কিছু করে দিন।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী, বর্ধমান।

রাহুল গান্ধীরা নিজেদের হিন্দু প্রমাণ করতে ব্যস্ত

গুজরাটের সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের তৎকালীন সহসভাপতি রাহুল গান্ধীর 'টেম্পল ভিজিট' বহুল চর্চিত বিষয়। নির্বাচনী প্রচারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন পুরোধা হিসাবে তিনি দলের গাইডলাইন 'ধর্মনিরপেক্ষতার' খোলস ছেড়ে 'হিন্দুত্ব' নামাবলী গায়ে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছিলেন। রাহুল গান্ধীর এই ভূমিকায় ভারতবর্ষের মুসলমান দলগুলির নেতারা যারপরনাই ক্ষুব্ধ। ভোট বড় বালাই! তাই নির্বাচনের প্রাক্কালে রাহুল গান্ধী একাই ২৫টি মন্দিরে পূজার ডালি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

১৮৮৫-র জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত কতিপয় জাতীয় নেতা ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্রীড়নক ছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতীয় কংগ্রেস নেহরু-গান্ধী নামধারী একটা পরিবারের দলে পরিণত হয়ে যায়। রাহুল গান্ধী এখন সেই পরিবারের শেষ প্রতিনিধি। রাহুল গান্ধীর গুজরাটের নির্বাচনী প্রচারের সূত্রে সোমনাথ মন্দিরে আগমন ঘটে। ইতিহাস খ্যাত এই সোমনাথ মন্দির এগারো শতাব্দীতে গজনির সুলতান মাহমুদ সতেরো বার লুণ্ঠন ও ধ্বংসসাধন করে ফিরে গিয়েছিল। মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার কাজটি সমাপন করে আওরঙ্গজেব। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাহুল গান্ধীর প্রপিতামহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর শত বাধা সত্ত্বেও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। মন্দির পুনর্গঠনের পর উদ্বোধনের দিন পণ্ডিত নেহরুর নিষেধ সত্ত্বেও ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ উপস্থিত থেকে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার পর নেহরু ধর্ম নিয়ে মাতামাতি না করে দলের নেতৃবৃন্দকে বেশি করে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করতে বললেন। আজকের রাহুল গান্ধীর এই ভূমিকা দেখে মনে হয় ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস নামক এক রাজনৈতিক দলের ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করা যেমন সহজ নয়, তেমন ধর্ম বর্জন করে রাজনীতিতে টিকে

থাকা ততটা সহজ হবে না। ভোট এলে নেহরু-গান্ধী পরিবারের সদস্যদের বেশি করে হিন্দুয়ানা দেখানো একটা নাটকীয় নকশা। নেহরু-গান্ধী পরিবারের ভাষায় ‘হিন্দুত্ব’ একটা উগ্রসাম্প্রদায়িকতা। শেষ পর্যন্ত রাহুল গান্ধী স্বঘোষিত পৈতেধারী ব্রাহ্মণ হয়ে গুজরাটের ভোটের ময়দানে লড়াই করতে নেমে মন্দিরে-মন্দিরে পুজোর ডালি নিয়ে হাজির হয়ে নিজেকে খাঁটি হিন্দু প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। গুজরাটবাসী অবশ্য রাহুল গান্ধীর এই বালখিল্যপনা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন।

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

বাঙালির পদবি

স্বস্তিকায় গত ১৩ নভেম্বর ২০১৭ প্রকাশিত বাঙালির উপাধি নিয়ে লেখা নিবন্ধটির জন্য লেখক রবীন সেনগুপ্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ। লেখক যেসব উপাধির কথা জানাতে পারেননি সেগুলি সম্বন্ধে প্রবীণ পাঠকদের সাহায্য চেয়েছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই চিঠি।

বরাহভূম অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ—

৩৩ পুরুষের আগে থেকে ঘোষাল ও মুখোপাধ্যায়গণ রাজপ্রদত্ত ‘দেওমরিয়া’ ‘চক্রবর্তী’ পরের দিকে চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঝি।

প্রথম পশ্চিমা পুরোহিত শুকল, পরের দিকে ষড়ঙ্গী ত্রিপাঠী ওড়িয়া ব্রাহ্মণ ও ওই শ্রেণীর মেট্যা, মহাপাত্র, সৎপতি, মিশ্র, হোতা।

উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাহান্তী, পণ্ডা, তেওয়ারী, পাত্র, মহাপাত্র, সিংহমহাপাত্র, লায়েক, পাইন, পতি-সৎপতি, পাঠক।

বিহারী ব্রাহ্মণ— পাণ্ডে, উত্তরপ্রদেশের পাণ্ডে, দাস, দাশ, মহান্ত। রাজস্থান থেকে আসা ক্ষত্রিয়— পূর্বে রাজস্থান। বরাহদেব, দর্পাস্বাহাদেব, নারায়ণ দর্পস্বাহাদেব, সিংহদর্প স্বাহাদেব, রাজবংশীয়গণ রাজা, হিকিম, বড়ঠাকুর, কুঁয়র, মুশিষ, বাবু সিংহদেব, যুবরাজ, সিংহবাবু। কর্মসূত্রে আসা--- সিংহখাওয়াস, মল্ল, ধল, সিংহমল্ল।

প্রতিবেশী কুটুম্বগণ--- শূরভূম দাক্ষিণাত্যের। বাকি সব রাজপুতানারা— মানভূমে নারায়ণদেব, ধবলভূমে ধবলদেব, ধবলশাহজাদাদেব, তুঙ্গভূমে নারায়ণ দেউ, সামন্তভূমে রায়, নারায়ণ, সিংহদেব, মল্লভূমে প্রথমে মল্লদেব পরে সিংহদেব; শূরভূমে মেদনীরায় মল্ল, মল্লভূম ঝাড়গ্রামে মল্ল ঔগালষন্তদেব, ধলভূম (নরসিংহগড়ে) দেওধবলদেব, আদিত্যভূমে (পাতকুম) আদিত্যদেব, সিংহভূম (চক্রধরপুর) সিংহদেও, শেখরভূমে (কাশীপুর) বিষ্ণুপুর, ছাতনা, শিলদা, শেখরদেব পরে সিংহদেও, শাহাবাবু এসব ছাড়াও নরসিংহগড়ে সানকি।

বরাহভূমে বৈদ্যগণ— নিয়োগী।

রাজস্থান থেকে আসা মাড়োয়ারিরা ‘দু-এক’ পুরুষ হতে মাড়োয়ারি বদলে— কাটারুকা, হংসিয়া, কেড়িয়া, বন্ধা সাহা, আগরওয়াল। কায়স্থগণ--- সেন, ঘোষ, বিশ্বাস, রায়, মিত্র, সরকার, বসু। করণকায়স্থগণ— হুঁকা বরদার, রাউৎ, দিগার ও দাস। মোদকগণ--- করমোদক, সিংহমোদক, চৌধুরী ও কুণ্ডু। তিলিগণ— দত্ত, রক্ষিত, সেন। স্বর্ণকার— বড়াল, দত্ত, দে। লোহারগণ— নামতা, দুয়ারী, দ্যাপ্যাঁত, গ্যাঁপ্যাত, কোটাল। ক্ষৌরকারগণ— মর্দ্দান্যা, প্রামাণিক। মেথরগণ— রাজস্থানী ভাংগী। বাউরীগণ--- ক্ষেত্রপাল--- হাড়িগণ--- সহিস--- বাদ্যকারগণ--- কালিন্দী--- ভূমিজগণ--- তরফ সরদার, সরদার ঘাটোয়াল, তাঁবেদার, গ্রাম্য সরদার, সরদার, সিংসরদার, সিংভুইঞা, সিংপাত্র, কাহান ডাংরী কুসুম, শিংলায়া।

ভুইঞাগণ— রায়, রায় ভূইঞা।

মৎস্যধরা—খুন্যা, কেউয়ট, ধীবর।

মুচিগণ—রুহিদাস, দাস, চর্ম্মকার।

—**রামকৃষ্ণ সিংহদেব,**
বরাহবাজার, বরাভূম, পুরুলিয়া।

গণতন্ত্রের অসম্মান

গুজরাট নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়ের পর প্যাটেল সম্প্রদায়ের নবোদিত নেতা হার্দিক প্যাটেল ইভিএমকে দায়ী করেছেন। কংগ্রেসের এই জোটসঙ্গী নেতা নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পর বলেছেন যে ইভিএম হ্যাক করে ও অর্থের প্রভাব খাটিয়ে বিজেপি এই জয়লাভ করেছে। হার্দিক প্যাটেলের এই মন্তব্য যে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্বাচন কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা, যারা নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের পরেও এসেছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে। হার্দিক প্যাটেলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যেনতেনপ্রকারে গুজরাট নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করা। কিন্তু গুজরাটের মানুষ বিজেপির পক্ষে রায় দেওয়ায় হার্দিক প্যাটেল চরম হতাশা থেকে এই ভিত্তিহীন মন্তব্য করে গণতন্ত্রকে অপমান করেছেন। এই ভিত্তিহীন মন্তব্য করার আগে তাঁর মাথায় রাখা উচিত ছিল যে বিজেপি যদি ইভিএমে কারচুপি করত তবে অল্পেশ ও জিগনেশের মতো নেতারা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারত না এবং কংগ্রেসও এত আসন পেত না। গণতন্ত্রে মানুষের মতামতকেই চরম সত্য হিসেবে মেনে নিতে হয় এবং নির্বাচনে পরাজয়কে মাথা পেতে নিতে হয়। একজন প্রকৃত আদর্শবাদী নেতা সবসময় মানুষের মতামতকে মাথা পেতে নেন। পরাজয়ের জন্য কোনও অজুহাতের আশ্রয় নেন না। কিন্তু হার্দিক প্যাটেল নির্বাচনে হেরে ইভিএমকে অকারণে দুষে গণতন্ত্রকে অসম্মান করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাবমূর্তিকেও কালিমালিপ্ত করেছেন।

—**অসীম সাহা,**
বীরনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

ভারত সেবাশ্রম
সঙ্ঘে মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মহাতীর্থ দ্বারকা

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

જય દ્વારકાધીશ મંદિર

পশ্চিম ভারতে (গুজরাট) আরব সাগর সৈকতে পবিত্র গোমতী নদীর উপকণ্ঠে দ্বারকা নগরীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপালক অর্থাৎ রাখাল বালক থেকে হয়েছিলেন দ্বারকার রাজা। ভক্তরা ভক্তিপূর্বক বলেন দ্বারকাধীশ। তিনিই দ্বারকেশ্বর। জগতের ঈশ্বর হলেও তিনি সমগ্র ভারতের সম্রাট বা রাজা ছিলেন না। কথিত আছে, বর্তমান যেখানে দ্বারকা নগরী বিরাজিত সেখান থেকে রাজধানী ছিল ১২ কিলোমিটার দূরে। পরে রাজ প্রাসাদ-সহ সমুদ্র দেবতা গ্রাস করে। জলের গভীর তলদেশে প্রাসাদের নমুনার সন্ধান মিলিছে।

আরব সাগরে প্রবাহিত পবিত্র গোমতী নদীর তীরে স্থাপিত হয়েছে দ্বারকাধীশ রণছোড়রায়ের মন্দির। প্রাচীন তত্ত্ববিদদের মতে এই মন্দির প্রায় ১২০০ বছরের পুরাতন। বর্তমান মন্দির শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ সমুদ্রে ডুবে যাওয়া অংশ থেকে পুনরায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান যে মন্দিরে পূজা আরতি হয় কথিত আছে এটা সপ্তমবারের স্থাপনা। এর পূর্বে আরও ছ’বার সমুদ্রে মন্দির ডুবে যায়।

দ্বারকা আজ আমাদের কাছে পরম ভক্তিময় মহাতীর্থধাম। সমুদ্র কিনারে এবং গোমতী তটে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য সুন্দর ভাবে বসার জায়গা, সিঁড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। আধুনিক সৌন্দর্যের মহিমায় সাজানো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সিন্ধুর আবেশময় সুশীতল সমীরণের পরশ উপভোগ করার জন্য স্বর্গসম পরিবেশ স্থল দ্বারকা। শ্রীকৃষ্ণের অমর স্মৃতির মানসে নির্মিত দ্বারকা যেন পবিত্র বাস্তব গোলকধাম। সমুদ্র কিনারে একাকী নির্জনে বিরলে বসলে মনে হয় যেন বাতাসের প্রতি কণায় কৃষ্ণ নামের মধুর হৃদয়স্পর্শী গুঞ্জন প্রবাহিত আবেশ জড়িত কী যেন এক প্রেমবিগলিত অলৌকিক কল্পনার আকর্ষণ। অন্তরে জাগায় এক মহা অনুভূতি। এই তীর্থ যেন ভাবময়, আবেশময়, প্রেমময়, ভক্তিময়, সাধনাময়, সকল মানব জাতির ও সাধকদের জন্য মুক্তির অমৃত আস্বাদের প্রবেশদ্বার। দিগন্তের অন্তিম প্রান্তের দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় যেন নিরাকার বিশাল সীমা বিহীন এক মুক্ত স্বাধীন স্থল যেখানে আত্মার মহাসুখে বিচরণ ক্ষেত্র, পবিত্র, কোলাহল শূন্য এক অলৌকিক জগৎ, মায়ারহিত আত্মার চিরন্তন মুক্তির মুক্ত প্রাঙ্গণ। কখনও মন ভাবাবিষ্ট হয়ে যায়, অন্তরে অনুভব হয় এক আত্মতৃপ্তির পরশ। দ্বারকা নগরীর এই পবিত্র স্থলে আজ তীর্থযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমতল ভূমি থেকে মুখ্য মন্দিরের উচ্চতা ১১০ ফুট। মন্দিরের চূড়ার উচ্চতা ৭০ ফুট। মন্দির চত্বরে আরও ২০টি মন্দির আছে। যেমন ত্রিবিক্রমরায়, মাধবরায়, রাধাকৃষ্ণ, দেবকীজী, বলদেবজী, গুরু দত্তাত্রয়, শ্রীপুরুষোত্তমজী, কল্যাণরায়জী, দুর্বাসা ঋষি, জাম্বুলক্ষ্মী, লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যভামাজী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, শারদা মন্দিরের শিখর ’পর মাতাজী, মুখ্য দরজার পাশে কুশোধর মহাদেব। গোমতী ঘাটে আছে গোমতী মাতা, পুরুষোত্তমজী, মহাপ্রভুজীর মন্দির ছাড়াও শিব এবং বিভিন্ন দেব মন্দির।

১৯১৯ সালের লোক গণনানুসারে দ্বারকায় লোকসংখ্যা ছিল ২৭,৮২৪ জন। ২০-২৫ বছর পূর্বের দ্বারকা আর এখনকার দ্বারকার মধ্যে অনেক প্রভেদ। বসতবাড়ির উন্নতি হয়েছে। রাস্তাঘাটগুলো সুন্দর হয়েছে সোসাইটিগুলি আজ সৌন্দর্যপূর্ণ সুসজ্জিত। এই নগরীতে আরও কিছু দর্শনীয় মন্দির ও বিভিন্ন স্থল, যেমন— রুক্মিণী মন্দির, গীতা মন্দির, ভদ্রকালী মন্দির, সঙ্গম ঘাট, চন্দ্রমৌলেশ্বর মহাদেব রামধনু সংকীর্তন মন্দির, ব্রহ্মকুমারী বিশ্ববিদ্যালয় সঞ্চালিত আর্ট গ্যালারি, স্বামীনারায়ণ মন্দির, কবির আশ্রম, কানদাস বাপুর আশ্রম, রুংপেনবন্দর, মহাপ্রভুজীর বৈঠক, পঞ্চনদ তীর্থ, ব্রহ্মকুণ্ড, কৈলাসকুণ্ড, সাবিত্রীরাও, গোমতী ঘাট, সানসেট পয়েন্ট, রামবাড়ি, স্টেশন রোডের উপর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ইত্যাদি। তীর্থযাত্রীদের জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে নির্মাণ করা হয়েছে নির্মল আকাশের নীচে সুন্দর মুক্ত পবন প্রবাহিত যাত্রীনিবাস। আরও কিছু দর্শনীয় স্থল যেমন— বেট সঙ্খোদ্বার, গোপীতালা, বারো জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে নাগেশ্বর মহাদেব, টাটা কেমিক্যাল, মীঠাপুর, ওখাবন্দর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থল বা মন্দির আছে। দ্বারকা নগরীকে এখন এক মহান ঐতিহাসিক হিন্দু তীর্থভূমি বলা যায়।

দ্বারকা নগরী থেকে বেট দ্বারকা প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্ব। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা দর্শনে যাওয়া বা আসার সময় গোপীতালা ও নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন করা যায়। বেট দ্বারকা সমুদ্র সৈকতে হলেও সেখানে যাওয়ার জন্য কিছু অংশ জলযানে পার হতে হয়। দ্বারকাধীশের রাজধানী ছিল দ্বারকা নগরীতে, কিন্তু রাজমহল ছিল বেট দ্বারকায়। বেট দ্বারকায় মন্দিরে যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত শোনা যায় তা পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন।

(লেখক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, দ্বারকা শাখার সন্ন্যাসী)

বিশ্বজয়ী বাঙালি যোগী সাধক শ্রীচিন্ময়

অমিত ঘোষদস্তিদার

চট্টগ্রামের ছেলে চিন্ময় কুমার ঘোষ দক্ষিণ-ভারতের অরবিন্দ আশ্রম হয়ে অন্তরের আদেশে চলে আসেন আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে। সেখানে তিনি নীল ধুতি-পাঞ্জাবিতে মানুষকে যোগের শিক্ষাদান করেন। আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে তাল রেখে ওয়েট লিফটিং, ম্যারাথন, টেনিস ইত্যাদির মাধ্যমেও মার্কিন মুলুকের মন জয় করেছেন তিনি।

১৯৬৪ সালের ১৩ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তিতে চিন্ময় নিউইয়র্কে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে প্রথমে তিনি ইন্ডিয়ান কনসুলেটে অস্থায়ী কেরানির কাজ করেন। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চর্চা চিন্ময় ঘোষের নিত্যদিনের কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আদর্শ। তাই তিনি তাঁদের মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। অস্থায়ী কেরানির কাজ করতে করতে একদিন চিন্ময় ঘোষ নিউইয়র্কের ইহুদি সিনেগগে পৃথিবীর পাঁচটি ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা সভায় অদ্ভুতভাবে হিন্দুধর্ম বিষয়ে বলার জন্য আমন্ত্রণ পান। খুব সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য তাঁকে ১০০ ডলার এবং একটি শংসাপত্র দেওয়া হয়। ক্লাইভ ইউনম্যান নামে এক ইহুদি গাড়িচালক নানা সময়ে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে শ্রীচিন্ময়ের বক্তব্য শুনতে শুনতে এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে করতে তাঁর অনুগত হয়ে যান। বিদেশে চিন্ময়ের প্রথম ছাত্র হলেন ক্লাইভ। চিন্ময় ‘শিষ্য’ শব্দটি ব্যবহার না করে তার বদলে ‘ছাত্র’ শব্দটি ব্যবহার করেন। চিন্ময় তাঁর প্রথম ছাত্র ক্লাইভের নাম দিয়েছিলেন—‘ভোলানাথ’। এইভাবে চিন্ময় ঘোষ ধীরে ধীরে তাঁর সাধন কাজের মাধ্যমে সাধক শ্রীচিন্ময়-এ রূপান্তর লাভ করেন। কনসুলেটের অস্থায়ী কেরানি থেকে নিউইয়র্কের নামি অঞ্চলের সাধক শ্রীচিন্ময় রূপে বিকশিত হয়ে উঠে খোদ ইউনাইটেড নেশনস্ ভবনেই প্রার্থনা সভা চালানোর বিরল সম্মান অর্জন করেন। এরপর হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, স্ট্যানফোর্ড ইত্যাদি স্থান থেকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন।

শ্রীচিন্ময়ের ছোটবেলার নাম ‘মাদল’। বয়সের নির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তাঁর ডিভাইন এন্টারপ্রাইজ-এর মাদলধ্বনি কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি স্থানকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করেছে। তাঁর ভক্তদের অনেকে ছোট ছোট দোকান খুলে বসেন—রেস্তোরাঁ, হেলথ ফুড, শাড়ির দোকান, রিটেল চেইন, ফুলের দোকান, ছোট্ট কারখানা, ছাপাখানা, এমনকী চুল ছাঁটার দোকান। শ্রীচিন্ময় বিশ্বময় তাঁর ডিভাইন এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এক অদ্ভুত সেতুবন্ধন এবং আর্তিবোধ তৈরি করে দিয়েছেন। ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সঙ্গে শ্রীচিন্ময়ের কোনও সম্পর্ক নেই। ভক্তমালিককেই প্রতিযোগিতা সামলে নিজের প্রতিষ্ঠান চালাতে হবে, তবে এঁরা অন্য ভক্তদের চাকরি দেন। কাজের সময় কোনও বিশেষ সুযোগ সুবিধে নেই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই লাঞ্চটাইমে মালিক, ম্যানেজার, কর্মীরা একসঙ্গে টিফিন খান, আবার একই সঙ্গে যোগশিক্ষার জন্যে, সাধনার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হন।

শ্রীচিন্ময় কোনও কিছুর প্রত্যাশা না করে আপন মনে ভারত- আত্মার বাণীগুলিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীচিন্ময়ের ছাত্ররা সংখ্যায় সীমাহীন না হলেও বিপুল। এঁদের সকলেই একটি ভারতীয় বা বাঙালি নামের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন, এই নামটি গুরু বা শিক্ষক শ্রীচিন্ময় দিয়ে থাকেন। প্রত্যেকের স্বভাব-চরিত্র- শিল্পবোধ, গুণ এবং দোষ বিচার করে শ্রীচিন্ময় তাঁদের এই নাম দিয়ে থাকেন। কেউ ‘নারদ’, কেউ ‘আশ্রিত’, কেউ ‘চাণক্য’, কেউ ‘ধনঞ্জয়’, কেউ ‘পার্বতী’, কেউ ‘সুরশ্রী’, কেউ বা নাম পান ‘ভৈরব’। এই নাম না পেলে ছাত্র-ছাত্রীদের মন ভরে না। শ্রীচিন্ময় প্রায় বিশ হাজার গান লিখেছেন, সেইসব গান বিশ্বময় তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচার করে চলেছেন। শাড়িপরা শ্বেতাঙ্গিনীরা পরম পবিত্রতায় শ্রীচিন্ময়ের গান গেয়ে জগৎময় শান্তির বাণী এবং ভারতীয় যোগশক্তির দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রচার-প্রসার করে চলেছেন। সরল এবং প্রচার বিমুখ শ্রীচিন্ময় বিশ্বব্যাপী এত মানুষের হৃদয়হরণ করেও শিকড় কেটে ফেলেননি। দূতরূপী বিশ্বজয়ী ভারত সন্তান শ্রীচিন্ময় অবশ্যই আমাদের গর্ব, অবশ্যই আমাদের নমস্য। তাঁকে স্মরণে রাখা আমাদের মহান কর্তব্য। ■

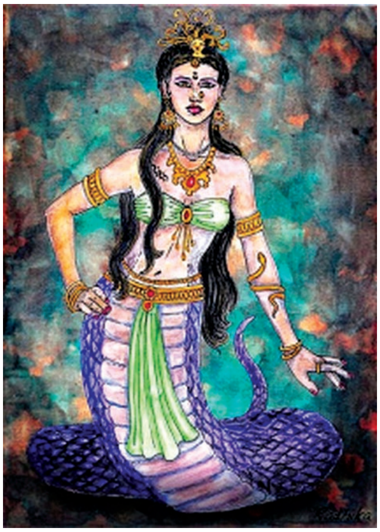

মহাভারতের অপ্রধান নারীচরিত্র

উলূপী

দেবপ্রসাদ মজুমদার

ঐরাবত বংশে নাগরাজ কৌরজের কন্যা উলূপী। এই প্রসঙ্গে ঐরাবতের বংশের সম্যক পরিচয় দরকার। মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী ছিলেন ক্রোধবশা। ক্রোধবশার কন্যা ভদ্রমতা। ভদ্রমতার কন্যা ইরাবতী। ইরাবতীর পুত্র ঐরাবত। ইরাবত অর্থে জল বোঝায়, জল থেকে জন্ম তাই ঐরাবত। ঐরাবত এই সুন্দরী কন্যাটিকে বিবাহ দেন, কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই উলূপীর স্বামী সুপর্ণ অর্থাৎ গরুড়ের দ্বারা অপহৃত ও নিহত হন। অনপত্যা সুন্দরী যুবতী উলূপী এরপর নাগলোকে পিতৃগৃহেই বাস করতে থাকেন।

এদিকে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে বাধ্য হওয়ায় পূর্ব নির্ধারিত শর্তানুসারে অর্জুনকে বারো বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে অরণ্যে বাস করতে হয়। রাজধানী ত্যাগ করে অর্জুন গৃহত্যাগী হন। তারপর নানা তীর্থ ভ্রমণ করে তিনি গঙ্গাদ্বার হরিদ্বারে এসে উপস্থিত হন। একদিন গঙ্গায় স্নান করতে নামলে অর্জুনকে দেখে কামাতুরা উলূপী তাঁকে নাগলোকে টেনে নিয়ে যান, সেখানে কৌরব্যগৃহে অগ্নিশালা দেখে সেই অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে নিত্যকর্ম শেষ করেন ও পরে উলূপীকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি তাঁকে পাতালে নাগলোকে এনেছেন। তদুত্তরে উলূপী নিজ পিতৃ পরিচয় দিয়ে বললেন— ‘হে মহাবাহো, তোমাকে স্নানকালে দেখেই আমি মোহিত হয়েছি, আমি তোমাকে পতি রূপে পেতে বাসনা করি।’ এরপর অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা ও ব্রহ্মচর্যের কথা প্রকাশ করলে উলূপী বললেন— “হে পাণ্ডব, তোমার ওই ব্রতের বিষয় আমার জানা আছে, দ্রৌপদী সম্বন্ধেই তোমার ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করা উচিত, আমার বাসনা পূরণ করলে তোমার ব্রতভঙ্গ হবে না। আমি তোমার শরণাগতা, শরণাগতা নারীর জীবন রক্ষা করলে ধর্মই হয়ে থাকে।” যাই হোক উলূপীর কাতর প্রার্থনায় অর্জুন সেই রাত্রি কৌরব্য ভবনে যাপন করে পরদিন উলূপী-সহ হরিদ্বারে উপস্থিত হলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে উলূপী অর্জুনকে বর দিলেন যে তিনি জলে অজেয় হবেন আর সমস্ত জলচর জন্তুসকল তাঁর বশ্য থাকবে। এই বরদান করে অর্জুনকে বিদায় দিয়ে উলূপী আবার তাঁর পিতৃগৃহে চলে যান। কালক্রমে ঊলূপী এক সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র লাভ করেন। ওই পুত্রের নাম ইরাবান।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুন অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নানা দেশ জয় করে মণিপুরে এসে উপস্থিত হলেন। মণিপুরে অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন নিজ পিতাকে ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করলেন। যুদ্ধকামী অর্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের এমন অভ্যর্থনাকে কাপুরুষোচিত মনে করে ধিক্কার দিলেন। ওই সময় অর্জুন বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করছেন জেনে নাগকন্যা উলূপী অবির্ভূত হয়ে, বভ্রুবাহনের সামনে নিজেকে মাতৃরূপে পরিচয় দিয়ে উপদেশ দিলেন— ‘বৎস, যুদ্ধার্থী পিতাকে যুদ্ধদ্বারাই পরিতৃপ্ত করো, এটাই ধর্মপালন’। এরপর আমরা দেখতে পাই বিমাতার পরামর্শে বভ্রুবাহন হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ও যজ্ঞাশ্ব অবরোধ করে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে বভ্রুবাহনের বাণে অর্জুন নিহত হন, আর বভ্রুবাহনও নিজেকে পিতৃহন্তা মনে করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ওই নিদারুণ সময়ে বভ্রুবাহন-জননী চিত্রাঙ্গদা এসে উপস্থিত হন ও শোকে অধীর হয়ে পড়েন। পুত্রকে পিতার সঙ্গে যুদ্ধে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করার জন্য উলূপীকে তিরস্কার করতে থাকেন।

এই মৃত্যুর মূল কারণ কুরুক্ষেত্রের মহারণে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে বাণবিদ্ধ করা। এইভাবে ভীষ্মকে পরাজিত করবার জন্য গঙ্গাদেবী ও অন্যান্য বসুরা অর্জুনকে নরকে যাবার অভিশাপ দেন। অভিশাপের কথা জানতে পেরে উলূপী তৎক্ষণাৎ নিজের পিতার কাছে গিয়ে জানান। উলূপীর পিতা কৌরব্য অর্জুনের শাপ মোচনের জন্য বার বার বসুগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা জানালে বসুগণ বলেন যে পুত্র বভ্রুবাহনের বাণে অর্জুন রণভূমিতে লুটিয়ে পড়লেই তিনি শাপমুক্ত হবেন। আর এই জন্য উলূপী পুত্র বভ্রুবাহনকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করেন। এরপর নাগলোক থেকে সঞ্জীবনী দিব্যমণি এনে উলূপী অর্জুনকে জীবিত করেছেন।

এরপর সবাইকে অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানিয়ে অর্জুন বিদায় গ্রহণ করেন। যথা সময়ে যজ্ঞকালে বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীকে নিয়ে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হন। ওই সময় কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার আদরযত্নে উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা বিশেষ রূপে আপ্যায়িত হন। যজ্ঞ সমাপনে আমরা দেখি যে বভ্রুবাহন মণিপুরে ফিরে যাচ্ছেন, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী হস্তিনাপুরেই থেকে যাচ্ছেন। দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সঙ্গে তাঁরাও মাতা গান্ধারীর সেবা করেছিলেন। আশ্রমিক পর্বে লক্ষ্য করা যায় কুন্তীদেবীর দর্শনের জন্য তাঁরা আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং ব্যাসদেবের অনুগ্রহে উলূপীও নিজ পরলোকগত পুত্রের দেখা পান। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের সময় উলূপী হস্তিনাপুরেই ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পরে উলূপী গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দেন। ■

অকারণ সন্দেহ সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলে

নয়নিকা সেন

সন্দেহ তৈরি হয় দু'টি কারণ থেকে। কারোর নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত বেশি ভাল ধারণা থাকলে। ভাবনার এই স্তরে সে মনে করতে থাকে যে, তার সেই 'ইমেজ' নষ্ট করার জন্য কেউ হয়তো চক্রান্ত করছে। আর অন্যটি হলো যাদের নিজেদের উপরে বিন্দুমাত্র ভরসা নেই। নিছকই দুর্বল মনের মানুষ তারা। শুধু ভাবতে থাকেন তাদের সম্পর্ক, তাদের সম্পত্তি, তাদের সবকিছুই অন্য কেউ কেড়ে নিতে পারে। সেই চিন্তাতেই ক্রমশ মাকড়সার জালের মতো সন্দেহের জাল তাদের গ্রাস করে নেয়। তা থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ নয়। সন্দেহের জাল ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে তাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ, গতি নষ্ট করে দেয়।

অত্যধিক অধিকারবোধও সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার আরেক কারণ হতে পারে। যখন মনে হতে শুরু করে সেই মানুষ বা মানুষগুলির উপরে শুধু তারই অধিকার রয়েছে, তখন সারাক্ষণই অকারণ ভয় পেতে থাকে, সে যদি তার জীবন থেকে সরে যায় তাহলে কী হবে? তারা কী কোনওভাবে ঠকাচ্ছে? তারা কী আরও ভালো অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে বা তাকে বেশি ভালবাসছে? এ ধরনের ভিত্তিহীন সন্দেহ মাথার ভিতর গিজগিজ করতে শুরু করে। অনেক বুঝিয়েও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও কাজ হয় না। কারণ মানবিক সম্পর্কে যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়। সন্দেহ সুস্থ, সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়।

সন্দেহের জাল থেকে মুক্তি খোঁজার উপায়টা নিজেকেই করতে হবে। অবশ্যই এর জন্য সন্দিগ্ধ মানুষটির শুভাকাঙ্ক্ষীদের পাশে থাকা প্রয়োজন। দরকার তাকে বন্ধুর মতো করে বোঝানো। মানুষ তো বুদ্ধিমান জীব। সন্দেহ তাকে যুক্তি-বুদ্ধির ওপারে নিয়ে যায়। একটু একটু করে সেই যুক্তির দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাকে। মানুষ যখন বুঝতে পারে যুক্তি-বুদ্ধিরহিত হয়ে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পড়েছিল, তখন নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে। নিজের চেষ্টাতেই অনেক সময়ে সে বেরিয়ে আসতে পারে সেই জাল ছিঁড়ে। শুধু বন্ধুর মতো ধৈর্য ধরে পাশে থাকা প্রয়োজন।

সন্দেহমুক্ত থাকার সেরা উপায় নিজের উপর আস্থা আর বিশ্বাস ধরে রাখা এবং অবশ্যই অতিরিক্ত অধিকারবোধ থেকে মুক্ত হওয়া। এইগুলি করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এগুলি শুধুই অভ্যাসের বিষয়। যদি একটু চেষ্টা করা যায়, তাহলেই করা সম্ভব। মনে রাখা জরুরি, একজন মানুষ তার নিজস্বতার কারণেই অন্যের থেকে আলাদা। সে যেমন, তেমনই। সমাজের চোখে নিজের একটা নির্দিষ্ট 'ইমেজ' তৈরি করার দায় তার নেই। বরং মন দিতে হবে ভালো মানুষ হয়ে ওঠার দিকে। নিজের জীবনের সাফল্য, ব্যর্থতার দায় তাকে নিজেকেই নিতে হবে। এরজন্যই আত্মবিশ্বাস আর নিজের উপর আস্থা ধরে রাখাটা খুবই জরুরি। একমাত্র তাতেই নিরাপত্তাহীনতা দূর হবে না, সন্দেহপ্রবণতা সহজে দূর করা যাবে।

দার্শনিকভাবে বললে মানুষ এই পৃথিবীতে কিছু নিয়ে আসেও না, কিছু নিয়ে যায়ও না। সুতরাং তার অধিকারবোধ তৈরি হওয়ার পিছনেও কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। এক জীবনে তার যা কিছু প্রাপ্তি তা এই জীবনকালের মধ্যেই আবদ্ধ। যতই অধিকার ফলানো হোক না কেন, জীবন শেষ হলে সবই ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। পিছনে ফিরে দেখার সুযোগটুকুও থাকে না। ফলে যতই 'আমার-আমার' বলে চিৎকার করা হোক, আসলে কেউ, কিছুই কারোর সম্পত্তি নয়। আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। অধিকারের বোধ থেকে বেরোতে পারলে সন্দেহের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস সন্দেহবাতিক থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে। দরকার একটা এমন জীবন যেখানে শান্তি আছে। শান্তি থাকলে, মানসিক নিরাপত্তা থাকলে সন্দেহের মতো খারাপ অভ্যাস থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অনেক মানুষই আছেন যারা জীবনে ঝুঁকি নিতে ভালোবাসেন, নিয়মের বেড়াজালে বাঁধা নয় তাদের জীবন, এক জায়গায় থিতু হতে চান না তারা— আপাতভাবে মনে হতে পারে এই মানুষগুলি যেন স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলেছেন, কিন্তু আসলে তারাই সুন্দর থাকেন। জীবনকে তারা ছন্দে চালাতে পারেন। কোনও কিছু তাদের শেকল পরাতে পারে না। সেইজন্যই সন্দেহের মতো অস্পষ্ট, আবছা জিনিসও তাদের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।

আসলে সবটাই যে মনের ব্যাপার। এই মন ফেরারি। কখনও সে আছে, কখনও সে উধাও। কখনও আমরা তাকে নিয়ে চলেছি নিজের মতো, কখনও সে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে তার পিছু পিছু। সাদা-কালো-ধূসর-রঙিন কতই না রং এই মনের। সন্দেহকে পুরে রাখতে হবে ওই মনের কালো বাক্সে। আর তার ঢাকনাটি খুললে চলবে না। কিছুতেই তাকে বেরোতে দিলে চলবে না। ∎

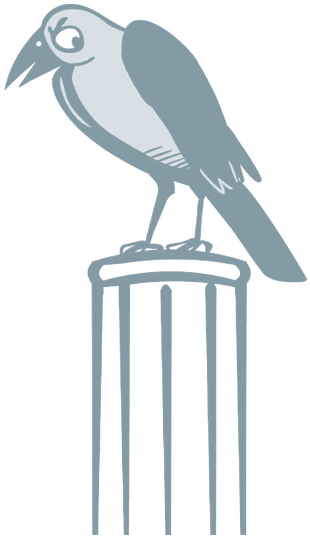

শেষ বিচারের আশায়

আসামি হাজির, কথাটা আদালত চত্বরে উচ্চরবে উচ্চারিত হতো, আসামিকে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর জন্যে বিচারের প্রয়োজনে। সম্প্রতি এক উলটো পুরাণে হাঁক পড়েছে, বিচারক হাজির, অভিযুক্ত হয়ে বিচারের জন্যে। সেই বিচারক যে খলিরাম ডেপুটি নন, উচ্চ আদালতের ন্যায়মূর্তি নন, একেবারে সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান ন্যায়াধীশ। অন্যায় করার দায়ে যাঁরা প্রধান ন্যায়াধীশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেন, সেই মহামতি চতুষ্টয়ও কেউ কম যান না। এক এক জন স্বমহিমায় উজ্জ্বল জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণতম বিচারপতি।

তাঁদের মধ্যে একজন যদি প্রধান বিচারপতির পদটি নিয়মের ফেরে একটুর জন্যে হারিয়ে মনোকষ্টের শিকার হন, তাহলে অপর একজন সেই পদটি পাওয়ার অধীর অপেক্ষায়। তবে প্রধান বিচারপতি যেই হন, এই মহামহিম চারজন বিচারপতিই হলেন ভারতীয় বিচারালয় ও বিচার ব্যবস্থার নিয়ামক যে সর্বোচ্চ সংস্থা সেই কলেজিয়ামের মাননীয় সদস্য। এঁদেরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারা দেশের তথা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি নিযুক্ত হন।

কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, সেই শান্ত সুগম্ভীর বিচারকদের মধ্যে অন্যায়ের প্রাবল্যে অসন্তোষের অগ্ন্যুৎপাত। এতদিন জনসাধারণ সুবিচারের আশায় যে বিচারকদের দ্বারে উপস্থিত হতেন, হঠাৎ দেখা গেল তার বক্রগতি। সর্বোচ্চ আদালতের সেই শীর্ষ বিচারকবৃন্দ সুবিচারের আশায় জনগণের দরবারে। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য তার একটি নিকৃষ্টতম নিদর্শন আছে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় যখন হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বঙ্গকংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন, তখন তিনি নির্বাচন প্রার্থী হয়ে বললেন, জনসাধারণই তাঁর সুপ্রিম কোর্ট, তাই সুবিচারের আশায় তিনি জনতার দরবারে। ভাগ্যের পরিহাসে দেখা যাচ্ছে, সেই সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিরাও আজ বিচারের জন্যে জনতার দরবারে আবেদন জানাতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। অবশ্যই তার বিশেষ তাড়না ছিল, কেননা তাঁরা নিজেদের বিবেক বিক্রয় করতে রাজি হননি। একদিন চীনের চেয়ারম্যান নিজের প্রতিপত্তি রক্ষায় 'ক্ষমতার দুর্গে আঘাত হানো' বলে কালচারাল রেভলুশনের মহান বালখিল্য বিপ্লবের নৈরাজ্যে সারা দেশকে নিয়জিত করেছিলেন। সেদিক দিয়ে দেখলে এই মহামান্য বিচারপতিরাও ক্ষমতার দুর্গে আঘাত হেনে এক অর্থে মাওবাদী।

অবশ্য বিবেকের ডাক এমনই জিনিস যে, ইহা যাহাকেই স্পর্শ করে তাহাকেই অস্থির করিয়া তোলে। অনেকটা ঠিক ভূতের ডাকের মতো, কিছুতেই স্থির থাকা যায় না। আমাদের মহান নেত্রী ইন্দিরাজি একবার বিবেকের তাড়নায়, দলে নিজের প্রস্তাবিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্যে বিবেক ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই বিবেকের আহ্বান একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচক, কেননা তা বিধিবদ্ধ নিয়মকে ধ্বংস করে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে। তাই মহীয়সী ইন্দিরাজিকে আবার দেখি বিবেকের আহ্বানে, জরুরি অবস্থা জারি করে, অনুশাসনপর্বে রোজ বাড়ির সামনে আমদরবার শুরু করলেন। আসলে গণতন্ত্রের মূল শর্ত, জনগণই ক্ষমতার উৎস। তাই মহামান্য বিচারপতিরাও, প্রথমত বিবেকের আহ্বানে ও দ্বিতীয়ত গণতন্ত্রের প্রেরণায় জনতার দরবারে নেমে এসেছেন। কবি কি বলেননি, সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।

তবে অন্যায়ের প্রতিবিধানে, বিবেকের তাড়নায় যা করা কর্তব্য, সেটা করাই যে শ্রেয়, সেকথা অনস্বীকার্য। কেননা মহাজন বাক্যতেই আছে, সত্যের জন্যে সবকিছু ত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু এই সদাশয় বিচারকদের প্রতিবাদী সত্যটা কী? আদালত চত্বরে, আইনজ্ঞদের কথা বোঝা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যঃ। তবে সোজাসাপটা যে কথাটা বোঝা গেল, তা হলো প্রধান বিচারপতি তাঁদের মতো সিনিয়র থাকতে অন্যায়ভাবে নাকি গুরুত্বপূর্ণ মামলা সব, তাঁর খেয়ালখুশি মতো জুনিয়রদের দিয়ে দিচ্ছেন। এবং সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তাতে কান দিচ্ছেন না। বটেই তো বটেই তো, ইস্কুলেও তো যদু চেঁচায়, স্যার আমাকে না দিয়ে মধুকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে। আর এ তো সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়।

প্রধান বিচারপতি যে এমনি পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না, তার কারণ হতে পারেন তিনি Roster master, কিন্তু তাঁকে মনে রাখতে হবে, তিনি First among equals, তাহলে দেখা যাচ্ছে All Indians are equal এবং প্রধান বিচারপতি হলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম মাত্র। তবে equal-দের মধ্যে আবার সিনিয়র, জুনিয়র বিভাগ কোথা থেকে আসে। জর্জ ওরওয়েলের কথাটা স্মরণ করা যেতে পারে। All are equal but some are more equal than others. প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে জজসাহেবরা সকলেই equal কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, কলেজিয়ামের বিচারপতিরা more senior than others.

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা, নিম্নআদালতের বিচারপতিদের মতো পরীক্ষা নিয়ে জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন না। আইনের আঙিনায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিচারে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁরা প্রথমে হাইকোর্টে ও পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তবে অনেক বাছবিচারের পর সুপ্রিম

কোর্টে নিয়োজিত হন। বিচারকার্যে যাঁরা আইনজ্ঞানের বিজ্ঞতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও বিচারমনস্বিতার পরিচয় দেন তাঁরাই হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে যান। একজন অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ বিচারক সুপ্রিম কোর্টে গেলেই তাঁর যোগ্যতা কিছু বাড়ে না, বা সুপ্রিম কোর্টে বয়স বাড়লেই তাঁর নতুন জ্ঞানের উদয় হয় না। আইনি প্রজ্ঞা যাঁর মধ্যে আছে তার পরিচয় হাইকোর্টেই পাওয়া যায়। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র প্রসঙ্গ তোলা স্বার্থান্বেষী অছিলামাত্র এবং হাস্যকর। তাহলে তো সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সিনিয়র মোস্ট বলে তাঁদের জন্যে একটি স্পেশ্যাল কোর্ট করে সব গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিচারের ভার তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট করা উচিত।

তবে বিচারকদের মধ্যে মামলা কীভাবে বিতরিত হবে, সে বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। Roster Master হিসেবে সেটি প্রধান বিচারপতির এক্তিয়ারে পড়ে। সেখানে স্বেচ্ছাচারের অবকাশ সম্বন্ধে সংবিধান রচনার সময় নাকি প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু ন্যায়ের বিচারে দীর্ঘ জীবন যাপন করার পর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মহদাশয়ত্বের প্রতি আস্থাই সংবিধান প্রণেতাদের হয়তো আশ্বস্ত করেছিল। কেননা একথা বোধ হয় তাঁদের চিন্তারও অতীত ছিল যে, যাঁদের গুরুত্ব প্রধান বিচারপতির সমতুল্য, তাঁরা এরকম প্রকাশ্যে প্রতিবাদে শামিল হতে পারেন। কিন্তু সারা দেশটা যখন কুশিক্ষিত রাস্তার রাজনীতিতে মহান হয়ে উঠেছে তখন বিচারকরাই বা জনতার কাতারে রাস্তায় নামবেন না কেন।

প্রাজ্ঞ আইনজ্ঞ সোলি সোরাবজি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, বিচারকরা এটা না করলেই পারতেন। কিন্তু বৃথাই তিনি অরণ্যে রোদন করেছেন। কারণ, যে সম্ভ্রমবোধ কারোর চরিত্রে নেই, তিনি অতি উচ্চাসনে বসলেও সজ্জনের মতো আচরণ করতে পারেন না। কিছু কিছু কিছু প্রোফেশনকে মানুষ খুব সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখত, Distinguished Profession হিসেবে। যেমন বিদ্যাচর্চা, গবেষণা, অধ্যাপনা, চিকিৎসা, আইনবিদ্যা বা বিচারকের কাজ। পূর্বসূরিদের সম্ভ্রান্ত আচরণের জন্যই এগুলি খুব সম্মানজনক ছিল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার শোচনীয় অবনমন হওয়ায় তা আজ আক্রমণের শিকার। যেমন শিক্ষক বা ডাক্তার। আইন ব্যবস্থাতে তেমনি স্যার রাসবিহারী বা স্যার আশুতোষের দৃষ্টান্তে আইনজ্ঞদের স্থান ছিল অত্যন্ত উচ্চে। বর্তমানে আদালতেই প্রমাণ হয় বিচারকদের অসাধুতার ও হীনবৃত্তির। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতির স্থান হয় আলিপুর জেলে। বাকি ছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেখানেও চূড়ান্ত অপরিণামদর্শী হীন চরিত্রের প্রকাশে বিচারকদের স্থান আর প্রশ্নাতীত রইল না।

এই মহামান্য বিচারকদের কাজকর্ম দেখে মনে হয় তাঁরা যেন হাত থাকতে মুখে কেন নীতিতে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রের ও বিচারকার্যের মূল শর্ত তো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মাননীয় বিচারকরা বলছেন, তাঁরা প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছিলেন কোনও ফল হয়নি। সুপ্রিম কোর্টে একটি ভালো নিয়ম আছে সকালবেলা একসঙ্গে চা-পর্বের পর কাজ আরম্ভ করা। এই চায়ে পে চর্চাতেই, প্রতিবাদ উত্তর প্রথম আলোচনা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতি বুধবার একটি একসঙ্গে মধ্যাহ্ন আহারেরও ব্যবস্থা থাকে। Tea break, Lunch meeting, বা Coffee break-এর মাধ্যমে সমস্ত জজদের সমাবেশে অনায়াসেই প্রধান বিচারপতির সঙ্গে একটি মুক্ত আলোচনা করা যেতে পারে। তাতে ফল না হলে লিখিত অভিযোগ জানানো যেতে পারে রাষ্ট্রপতিকে, যিনি সেটা পরে সুপ্রিম কোর্টে রেফার করতে পারতেন।

কিন্তু সেসব সভ্যপন্থা পরিহার করে হঠাৎ হাটের মাঝখানে এই মলিন কাঁথা কাচার অবশ্য অন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সেই সন্দেহই ঘনীভূত হয়, সিপিআই পার্টির নেতার, প্রতিবাদী বিচারকদের পাণ্ডার কাছে গমন, বোধহয় দক্ষিণী বেরাদরির সূত্রে। আসলে বিরোধটা ঘনীভূত হয় বোধ হয়, অকালপ্রয়াত সিবিআই বিচারক জাস্টিস লোয়ার মামলা নিয়ে। কেননা এই মামলার সঙ্গে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ জড়িত। সুতরাং তালেগোলে যদি অভিযোগের তিরটা অমিত শাহের দিকে নিক্ষেপ করা যায় তাহলে তার একটা রাজনৈতিক ফায়দা হতে পারে। যেমন জঙ্গি ইসরাত জাহানের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে, গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট মেরামতি করে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমের কারিকুরিতে আদালত প্রভাবিত হয়ে রায় দেয়, অনেককেই অন্তরীণ করে। এক্ষেত্রেও পরিচিত দুষ্কৃতী সোহরাবুদ্দিনের মামলা নিয়ে সাধুতার আইনে খেলা সুপ্রিম কোর্টের প্রভাবিত বিচারপতির রায়ে অন্যরকম হলে বিরোধী রাজনৈতিক ফায়দা তোলা খুবই সহজ হয়ে দেখা যেতে পারে। দেশকে জঙ্গিমুক্ত করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অশুভ শক্তির শিকড় উপড়ে না ফেললে মুক্তির দিশা নেই। রাজ করেগা খালসাতে পঞ্জাব যখন উত্তাল হয়েছিল, বা বঙ্গে নকশাল তাণ্ডব যখন নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল তখন কেপিএস গিল বা রঞ্জিত গুপ্ত শক্ত হাতে হাল না ধরলে তাদের খতম অভিযান আজও অব্যাহত থাকত।

আসলে এখনও দেশে বা জনসমাজে সুপ্রিম কোর্টের মান্যতা যথেষ্ট অপরিসীম। তাই রাজনীতির প্রভাবে যদি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কাজে লাগানো যায়, তাহলে শূন্য রাজনীতির অকূলে কূল পাওয়ার সম্ভাবনা। সেজন্যেই মনে হয় সুপ্রিম কোর্টে মামলা বণ্টন নিয়ে এত মাথাব্যথা। তবে একথা ঠিক যে Master Roster হলেও প্রধান বিচারপতির একার সিদ্ধান্তের বদলে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভার মতো, ব্রাদার জাজদের নিয়ে একটি আলোচনা পর্যালোচনার সুযোগ থাকা স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে খুবই বাঞ্ছনীয়।

তবে মুশকিল হচ্ছে আমাদের বিচার বিভাগে ন্যায়ের দণ্ড তুলে ধরার কথা, কিন্তু সেখানে দেখা যায়, তুলাদণ্ড প্রায়শই আইনের ফাঁক দিয়ে একদিকে হেলে পড়ে। বিচার ব্যবস্থায় এখন পুঞ্জীকৃত অনাচারের চূড়ান্ত এবং এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বজনপোষণ। ডাইন্যাস্টিক ডেমোক্র্যাসির মতো হেরেডিটারি জজিয়তির প্রাবল্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এই অব্যস্থাকে জিইয়ে রাখাই হয়ে উঠেছে আমাদের বিচারব্যবস্থার কর্ম। সেইজন্যেই বোধহয় আজও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

কলকাতা বই মেলা—২০১৮
স্থান
সল্টলেক, করুণাময়ী সেন্ট্রাল পার্ক
৩১ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টল নং-২৩৩

ব্রণের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে হোমিও চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

আজকাল যুবক-যুবতী ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্রণের সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর প্রভাব ফেলে থাকে। মুখে ব্রণ বা ব্রণের দাগ শত চেষ্টাতেও লোকচক্ষুর আড়াল করা যায় না। ব্রণের সমস্যা দূর করতে অনেকে নানা চিকিৎসা পদ্ধতি, টোটকার সাহায্য নেন। মুখের বিচ্ছিরি দাগগুলো পুরোপুরি মুছে ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ তরতাজা ত্বক পেতে অনেকে আবার বিউটি-পার্লারে গিয়ে বিভিন্ন ফেসিয়াল ট্রিটমেন্টের সাহায্য নেন। এর সঙ্গে নানান শুভানুধ্যায়ীর নিঃশুল্ক পরামর্শ, প্রত্যাশিত ফলের পরিবর্তে অপ্রত্যাশিত কুফলের আকার নেয়। এর থেকে কিছু জনের মধ্যে মানসিক অবসাদও লক্ষ্যণীয় হতে পারে। তাই ব্রণজনিত সমস্যা সম্পর্কে সঠিক জানা একান্ত প্রয়োজন।

● ব্রণ কী :

প্রথমেই জানা দরকার এটি বয়সন্ধির রোগ। ব্রণ হচ্ছে সিবেসাস গ্লান্ডের গোলযোগ সংক্রান্ত ত্বকের একটি খুবই প্রচলিত রোগ। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপে ত্বকের সিবেসাস গ্লান্ডগুলির (তৈলাক্ত গ্রন্থি) কাজ বাধাপ্রাপ্ত বা বিঘ্নিত হলে সেগুলি বিশেষত মুখে, চুলের গোড়ায় ও অনেক সময় পিঠের দিকেও ক্ষুদ্রাকার ফুসকুড়ির মতো ব্রণ তৈরি করে। প্রধানত তৈলাক্ত ত্বকে এধরনের সমস্যা বেশি হয়ে থাকে।

● ব্রণ কত ধরনের হয় :

লক্ষণ অনুসারে ব্রণকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) একনি ভালগারিস (ACNE VULGARIS), (২) একনি ইন্ডুরেটা (ACNE INDURATA), (৩) একনি রেজিওলা (ACNE REGIOLA), (৪) একনি টিউবারকুলেটা (ACNE TUBURCULATA)।

● ব্রণ হওয়ার কারণ কী কী :

এক্ষেত্রে কোনও একটি নির্দিষ্ট কারণকে সুনির্দিষ্ট ভাবে দায়ী করা যায় না। অনেকগুলি কারণেরই উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্বক তৈলাক্ত হলে ব্রণের সঙ্গে খুসকির সমস্যাও দেখা দেয়। অনেক সময় জিনগত বা বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবেও ব্রণ জাতীয় সমস্যা মাথাচাড়া দেয়। ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ কিশোরীদের মধ্যে ব্রণ হওয়ার কারণ হিসেবে অনিয়মিত ঋতুস্রাবকে দায়ী করা হয়। এছাড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটের গোলমাল, লিভার সমস্যা, জল কম খাওয়া, অতিরিক্ত হস্তমৈথুন, অধিক গুরুপাক খাদ্যগ্রহণ, উত্তেজক বস্তুর সংস্পর্শ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রভৃতির জন্য ব্রণ হয়ে থাকে।

● কীরকম সর্তকতা নেওয়া প্রয়োজন :

ব্রণর সমস্যা প্রায় দেখা গেলেও সাবধানতা অবলম্বন করলে এগুলো বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে না। প্রতিদিন নিয়মমাফিক বেশি জলপান করতে হবে। লেবু, আপেল, শসা, তরমুজ প্রভৃতি ফলগুলি খাদ্যতালিকায় বেশি করে রাখতে হবে। ফাস্টফুড, ভাজাভুজি, বার্গার প্রভৃতি তৈলাক্ত খাবার বর্জন করতে হবে। মাছ, মুরগির মাংস, বিভিন্ন শাসকসবজি খাওয়ার পাশাপাশি উচ্ছে, নিমপাতা জাতীয় তেতো স্বাদের খাবার বিশেষ উপকারী। দেহে প্রয়োজনীয় জল ও পুষ্টিকর খাদ্যের ঘাটতি পূরণ হলে ব্রণের সমস্যা অনেকটা দূর হয়ে যায়।

● চিকিৎসা :

ব্রণের সমস্যা দূর করতে লোকমুখে শোনা বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার, বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে বিভিন্ন ক্রিম মাখা এবং দাগ লুকোতে মেকআপ অনেকে করে থাকেন। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভবনা বেড়ে যায়। অনেক সময় একটা দুটো ব্রণ সারাতে গিয়ে অগুন্তি ব্রণে মুখ ভরে যেতে দেখা যায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা। আমি যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি সেগুলি হলো, থুজা, সালফার, ক্যালিব্রোম, নেট্রাম মিউর, গ্রাফাইটিস প্রভৃতি। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। সবশেষে বলি, রোদ পরিহার করুন। ব্রণ কখনই নখ দিয়ে খোঁটাখুটি করবেন না। তাতে ইনফেকশন ও ক্ষত হবার সম্ভাবনা থাকে। আর তা থেকেই দীর্ঘদিন স্থায়ী দাগের সৃষ্টি হয় যাতে সৌন্দর্যহানি ঘটে।

(যোগাযোগ : ৯১৬৩২৬৮৬১৬)

অন্য রকম

গীতাপাঠে পুরস্কৃত পনেরো বছরের আলিয়া খান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আলিয়া খানের বয়েস মাত্র পনেরো বছর। ক্লাস টেনের ছাত্রী। কিন্তু তার সাহসের পরিচয় পেলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। দেওবন্দ দারুল উলুমের ফতোয়া পাবার পরেও সে অকুতোভয়। চাপে ভেঙে পড়ার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এ হেন বত্‌তমিজির জন্য নিশ্চয়ই দাঁতে দাঁত ঘষছেন মুসলমান সমাজের মৌলবাদীরা। তবে তাদের কথা এখন নয়। আগে বরং দেখে নেওয়া যাক আলিয়া কী এমন করল যে দুনিয়া-কাঁপানো সংগঠনকে তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করতে হলো?

ঘটনাটা গত বছরের একেবারে শেষের দিকের। স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ লক্ষ্ণৌচুক্তির শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যোগী আদিত্যনাথ সরকার বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের একটি পর্বে ছিল গীতার শ্লোক আবৃত্তির প্রতিযোগিতা। নাম দিয়েছিল অনেকেই। তাদের মধ্যে একটি নাম আলিয়া খানের। শ্রীকৃষ্ণের সাজে নিজেকে সাজিয়ে সে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করে। তার সংস্কৃত উচ্চারণে, অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হয়ে যান শ্রোতারা। ফলস্বরূপ মেলে দ্বিতীয় পুরস্কার। কিন্তু দ্বিতীয় হয়ে সে খুশি নয়। সে প্রথম হতে চেয়েছিল। এমনকী তার মা আফরোজ খানও চেয়েছিলেন তাঁর মেয়ে প্রথম হোক। সেকথা মুখে স্বীকার করতেও তার কুণ্ঠা নেই। নির্দ্বিধায় তিনি বলেন, ‘আলিয়া প্রথম হলে আমার আরও ভালো লাগত। যদিও দ্বিতীয় হওয়াটাও যথেষ্ট কঠিন কাজ। শিক্ষকদের পরিশ্রম এবং একাগ্রতার জন্যই আলিয়া আজ এখানে পৌঁছতে পেরেছে।’

আফরোজের কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, বর্তমান সময়ে মুসলমান মহিলারা পর্দাপ্রথাকে উপেক্ষা করে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখার যে মানসিকতা অর্জন করেছেন আলিয়ার ঘটনা তারই ফসল। গীতাপাঠ নিয়ে সে সেসব কথা বলেছে তাতে বোঝা যায় বয়েসের তুলনায় সে যথেষ্টই পরিণত। তার বিচারবোধও বেশ আধুনিক। গোঁড়ামি এবং ভণ্ডামি থেকে মুক্ত। অন্য ধর্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থপাঠে মুসলমানি ছুৎমার্গ প্রসঙ্গে সে বলে, ‘এই নিয়ে আমায় যদি কেউ কিছু বলে, তাকে বলব গীতা আমি ধর্মের জন্য পড়ি না। জানার জন্য পড়ি। শেখার মতো কিছু থাকলে পৃথিবীর যে কোনও জায়গা থেকেই শেখা যায়।

কিন্তু হিন্দু পৌত্তলিকদের সঙ্গে এরকম মাখামাখি ইসলামের পাহারাদারদের সহ্য হবে কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইশ্বরকে জানার জন্য ইসলামিক মতেও সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন কোরান ও হাদিশে সুপণ্ডিত। সাম্প্রতিক সময়ে লেখক ও গবেষক রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীও ইসলাম ধর্মতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। এরা সকলেই হিন্দু এবং এদের জ্ঞানস্পৃহার কারণে হিন্দুধর্মের কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যায়নি। অথচ আলিয়ার খবর মিডিয়ায় প্রকাশিত হওয়ামাত্র তালিবান সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর ধাতৃভূমি নামে খ্যাত দেওবন্দ দারুল উলুমের মুফতি এবং উলেমারা ছুরিতে শান দিয়ে নেমে পড়েছে। তাদের দাবি, আলিয়া ইসলাম বিরোধী কাজ করেছে। ইসলাম মুসলমান শিশুদের এই ধরনের কাজ করার অনুমতি দেয় না। দেওবন্দের ফতোয়া বিভাগের নেতার প্রশ্ন, ‘আলিয়া কোন সাহসে কৃষ্ণ সাজলে? এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ব্যাপার।’ অতঃপর আলিয়ার নামে ফতোয়া জারি হতে বিশেষ দেরি হয়নি।

ফতোয়া জারি হবার পর তার ব্যাখ্যা দিয়েছে দারুল উলুমের কর্তারা। ফতোয়া বিভাগের চেয়ারম্যান মুখতি আরশাদ ফারুকির অভিমত, মেক আপ এবং নকল পোশাকের সাহায্যে সেজে কারোর মতো হয়ে ওঠা ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামি পরিভাষায় একে বলে সির্‌ক। এর অর্থ ইসলাম ছাড়াও অন্য ধর্মে বিশ্বাস রাখা। তিনি বলেন, ‘আলিয়া যা করেছে সেটা সির্‌ক।’ ফারুকি প্রতিটি স্কুলকে মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের এই ধরনের অনুষ্ঠানে শামিল না করার অনুরোধ করেন।

আলিয়া অবশ্য দারুলের ফতোয়ায় বিন্দুমাত্র ভীত নয়। সে বলে, ‘কারোর দক্ষতাকে ধর্মের নামে ঘরবন্দি করে রাখা মোটেই কাম্য নয়।’ সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় তার ক্ষোভ বারবার ঝরে পড়েছে। তার ক্ষুব্ধ জিজ্ঞসা, ‘কারও যখন কোনও অসুবিধে নেই তখন উলেমারা কেন আমায় আটকে রাখতে চাইছে?’ তার উপলব্ধি, ‘গীতা কোনও সাধারণ ধর্মগ্রন্থ নয়। গীতায় রয়েছে কর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান। আর জ্ঞান আমি পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে আহরণ করতে পারি।’ ■

চণ্ডীদা চলে গেলেন

বিজয় আঢ্য ॥ স্বস্তিকার সঙ্গে চণ্ডীদার— চণ্ডী লাহিড়ীর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। স্বস্তিকা পূজা সংখ্যার বলতে গেলে তিনি নিয়মিত লেখক। বেশ কয়েক বছর ধরে পূজা সংখ্যায় লেখার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে উনি বলতেন, ও তুমি ভেবো না। ঠিক সময়ে পেয়ে যাবে। পাওয়াও যেত তবে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে হতো। আসলে স্বস্তিকার প্রয়াত সম্পাদক ভবেন্দু ভট্টাচার্যর তিনি বন্ধু। দুজনেই বেড়ে উঠেছেন নবদ্বীপে। ভবেন্দুদার তরুণ বয়স থেকেই নাটকের শখ ছিল। সেই সূত্রেই দুজনের পরিচয়। পরে দুজনেই কলকাতার বাসিন্দা হয়েছেন। দুজনেই পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। নবদ্বীপের পরিচয় কলকাতায় আরও ঘন হয়েছে। ভবেন্দুদা আগেই গত হয়েছেন। কয়েকদিন আগে ১৮ জানুয়ারি চণ্ডীদাও চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল ৮৬।

১৫ মার্চ, ১৯৩১-এ নবদ্বীপে প্রথিতযশা কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ীর জন্ম। নবদ্বীপ মামার বাড়ি। পৈতৃক ভিটে কৃষ্ণনগরে হলেও বড় হয়েছেন নবদ্বীপেই। চল্লিশের দশকে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বোমা বাঁধতে গিয়ে বাঁ হাতটি চলে গিয়েছিল। নবদ্বীপে স্কুল-কলেজের পাঠ শেষ করেছেন। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে হয়েছেন স্নাতক।

কলেজে এসে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। সেই সূত্রেই ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক। তবে পড়াশোনার প্রতি ঝোঁক ছিল। পড়তে ভালবাসতেন। কলেজ জীবন থেকেই ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন আঁকার দিকে একটা টান ছিল। অমৃতবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (পিসিএল), শৈল চক্রবর্তীর আঁকা কার্টুন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এরপর কলকাতায় এসেছেন। পরে থাকতেন পাইকপাড়ার সরকারি আবাসনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এমএ করেছেন।

১৯৫৩-তে লোকসেবক পত্রিকায় সাব এডিটর হিসেবে যোগ দেন। এরপর টানা ঊনত্রিশ বছর— ১৯৬২ থেকে ১৯৯০ আনন্দবাজারে। তির্যক শিরোনামে তাঁর কার্টুন প্রকাশিত হোত। আম-বাঙালি তা রসিয়ে উপভোগ করতেন। তাঁর কার্টুনের বেশির ভাগটাই থাকত রাজনীতি নিয়ে। বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, জ্যোতি বসুর মতো নেতাদের নিয়ে কার্টুন এঁকেছেন। তাতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় কোনও আঁচ লাগেনি। আসলে মানুষকে সচেতন করার কাজটিই তিনি করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, কার্টুন নিয়ে প্রথাগত শিক্ষা তিনি কখনও নেননি। বোধ হয় কার্টুনিস্ট তৈরি করা যায় না। এই রসবোধ সহজাত। তাঁর এই রসবোধের সস্নেহ প্রশংসা করেছেন অগ্রজ কার্টুনিস্ট কুট্টি। বলেছেন— এক হাতেই যা কর, দুটো হাত থাকলে তো দেখতে হোত না। তিনি নিজেও বলতেন- তলোয়ারের এক দিকেই ধার থাকে। বস্তুত কার্টুনের যে বৈশিষ্ট্য— বিষয় নির্বাচন ও আঁকার হাত দুটোই তাঁর ছিল।

কার্টুন ছাড়াও কুমারেশ ঘোষের যষ্ঠিমধুর যে লেখাগুলি, বহু বইয়ের প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ তিনি করেছেন। চারমূর্তি, মৌচাক, ধন্যি মেয়ে, পাকা দেখা-র মতো চলচ্চিত্রে চরিত্রলিপিও রচনা করেছেন। আমৃত্যু তিনি কার্টুন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়েই ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে বাঙালির কার্টুন চর্চার একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। স্বস্তিকাও হারাল তাঁর এক আপনজনকে।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগরের পূর্বতন মহানগর সহ-সঙ্ঘচালক সুশীল দলুইয়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী দেবী দলুই গত ৬ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি স্বামী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বসিরহাট জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার বৈদ্যের মাতৃদেবী কৌশল্যা বৈদ্য পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

তিনি ৪ পুত্র, পুত্রবধূ, ১ জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর বড় পুত্র অজিত বৈদ্য ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের বাণপ্রস্থী কার্যকর্তা। মধ্যম পুত্র বঙ্কিম বৈদ্য স্বয়ংসেবক, তৃতীয় পুত্র তপন বৈদ্য আরোগ্য ভারতীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তা এবং কনিষ্ঠপুত্র জেলা সঙ্ঘচালক।

উপনিষদ্ কথা

নচিকেতা

অনেক অনেক দিন আগে বাজশ্রবস নামে এক ঋষি ছিলেন। একবার ঠিক করলেন তিনি ‘বিশ্বজিৎ’ নামে একটা যজ্ঞ করবেন। এই যজ্ঞের নিয়ম হলো যজ্ঞকর্তাকে নিজের সব কিছু সেই যজ্ঞে দান করে দিতে হয়। বাজশ্রবস ছিলেন একটু কিপটে ধরনের লোক, তিনি যজ্ঞের শেষে দান করতে বসে যত রোগা রোগা বুড়ো গোরু ব্রাহ্মণদের দিতে লাগলেন।

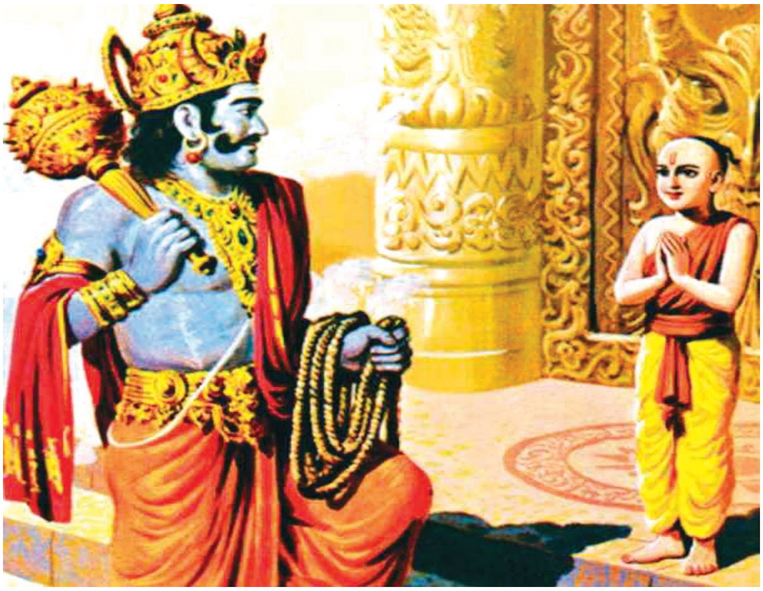

বাজশ্রবসের ছেলে নচিকেতা দক্ষিণাদানের সময় বাবাকে ওইরকম রোগা বুড়ো গোরু দিতে দেখে তার ভয়ানক খারাপ লাগল। তখন বাবার কাছে গিয়ে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, ‘বাবা, আমাকে কার কাছে দান করলেন?’ বাবা তো এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে বিরক্ত। নচিকেতা তিন বার সেই একই প্রশ্ন করল, মহা চটে উঠে বললেন, ‘যা, তোকে যমের কাছে দান করলাম।’

তার মনে প্রথমটায় খুব দুঃখ হলো। সে ভাবল, আমি তো খুব খারাপ ছেলে নই, অনেকের মধ্যে আমি প্রথম হই, আবার অনেকের মধ্যে আমি মাঝারি, কিন্তু একেবারে অধম আমি কখনোই নই। ছোটো নচিকেতা পৌঁছে গেল যমের বাড়ি। যম তখন বাড়ি ছিলেন না। তিন দিন তিন রাত নচিকেতা বসে রইলেন যমের দুয়ারে তাঁর অপেক্ষায়। তিন দিন বাদে বাড়ি ফিরতেই যম তাড়াতাড়ি ছুটলেন নচিকেতার কাছে, হাতজোড় করে তার কাছে ক্ষমা চাইলেন তার এই কষ্টের জন্যে। বললেন, ‘নচিকেতা, তিনটি রাত তুমি উপোস করে কাটিয়েছ। রাগ করনি। তাই আমি তোমাকে তিনটি বর দিতে চাই। বলো তুমি কী কী বর চাও?

শান্তভাবে সে বলল, ‘হে যমরাজ, আপনার কাছ থেকে ফিরে আমি যখন বাবার কাছে যাব, তখন বাবা যেন আমাকে তাঁর ছেলে বলে চিনতে পারেন। আর আমার উপরে তাঁর যত রাগ ছিল তাও যেন মিটে যায়। এই আমার চাওয়া প্রথম বর।’

যমরাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘তথাস্তু! দ্বিতীয় বর তুমি চাও। সে বলল, ‘হে মৃত্যু, স্বর্গে তো কেউ বুড়োও হয় না, মরেও না, চিরকাল আনন্দে থাকা যায়, সেই অগ্নিবিদ্যা আমাকে দান করুন।’

নচিকেতার প্রার্থনা শুনে যম অত্যন্ত খুশি মনে নচিকেতাকে সেই বিদ্যা শেখালেন, বললেন, ‘তাই আজ থেকে অগ্নিবিদ্যার ওই আগুনের নাম তোমার নামে হবে। যে ওই নচিকেত অগ্নি তিনবার চয়ন করবে, সে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে চিরকাল স্বর্গে সুখে থাকবে। তোমার জানার আগ্রহ দেখে খুশি হয়েছি, তাই এইবার তুমি তৃতীয় বরটি চাও।’

নচিকেতা খুব গভীরভাবে ভাবল। সে বলল, ‘হে যমরাজ, মৃত্যুর পর আত্মা আছে কি না সেই বিষয়টি আমি আপনার কাছে জানতে চাই। আপনি আমাকে ‘আত্মবিদ্যা’টি শেখান।

যম বললেন, ‘দেখো নচিকেতা, তুমি এবার একটা এমন জিনিস চেয়েছ যা দেওয়া সম্ভব নয়।’

নচিকেতা বললেন, ‘হে মৃত্যু, আমি আপনার মতো আর কাউকে পাব না, যিনি এই বিদ্যা সম্পর্কে বলতে পারেন, এই বরের সমান অন্য কোনও বর নেই যা আমি চাইতে পারি। কাজেই আপনাকে আমায় এই বরই দিতে হবে।’

যম নচিকেতাকে ভোলাবার জন্যে বললেন, ‘আমি তোমায় এমন বর দিচ্ছি যাতে তুমি বহু ধনসম্পদ সোনাদানা হাতি-ঘোড়া বিরাট জমি জমার মালিক হয়ে একশো বছর সুখে বাঁচতে পারো, যাতে তোমার ছেলেপুলে নাতি-নাতনিরাও একশো বছর সুখে বাঁচে। যা কিছু জীবনে পেতে চাও নচিকেতা, সব পাবে, পৃথিবীতে যেসব ধন সহজে পাওয়া যায় না, তাও পাবে। এই যে দেখো, কত সব সুন্দর রথে নানান বাজনা বাজাচ্ছে অপ্সরাদের দল, মানুষ এদের দেখা পর্যন্ত পায় না, তুমি চাইলে এরা গিয়ে তোমার সেবা করবে। নচিকেতা, তুমি এসব নাও, মৃত্যুর পরের কথা জানতে চেয়ো না।’

নচিকেতার অজানাকে জানার কী আশ্চর্য জেদ! অন্য কিছু সে চায় না।

যম দেখলেন এ ছেলেকে ভোলানো অসম্ভব। তার মনের জোর, জানার ইচ্ছে, লোভ জয় করার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। বুঝলেন, এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা শেখানোর জন্যে নচিকেতার থেকে যোগ্য ছাত্র তিনি পাবেন না। তখন খুশি মনে যম নচিকেতার কাছে সেই পরমবিদ্যার রহস্য জানাতে বসলেন। সেই বিদ্যাটি কী ছিল, তা জানতে গেলে কঠোপনিষদ পড়তে হবে।

নচিকেতা সেই পরমবিদ্যা জানতে পারল কারণ, তার জ্ঞানের অহঙ্কার ছিল না, আর সে জানতে চেয়েছিল মনেপ্রাণে, তার নামই যে ছিল ‘ন চিকেতা— মানে, যে জানে না’।

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

চন্দ্রকেতু গড়

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত ও বসিরহাটের মাঝে চন্দ্রকেতু রাজার রাজধানী দেউলিয়া বা বেড়াচাঁপা। এখানে ১৯৫৫ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে মহোঞ্জোদারোর সমকালীন এক বন্দর নগরী রাজা চন্দ্রকেতুর গড়। দেবালয়, হাজিপুর, শানপুকুর, ঝিকড়া প্রভৃতি গ্রামের ৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ২৫ ফুট উঁচু চন্দ্রকেতুগড়ের ঢিপি। মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, সেন ও পালযুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে ঢিপির নীচে। এখানে কালো পালিশ করা মাটির পাত্রে খরোষ্টি লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। দূরদূরান্ত থেকে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু মানুষ প্রতিদিন এখানে আসেন।

জানো কি?

- মানবসভ্যতার ধাত্রীভূমি বলা হয় ভারতবর্ষকে।
- প্রভাত সূর্যের দেশ জাপান হলেও নিউজিল্যান্ডের ইস্ট কেপে প্রথম সূর্য দেখা যায়।
- পৃথিবীতে সবচাইতে বড় মরুভূমি দক্ষিণ আফ্রিকার সাহারা।
- শেষ সূর্যাস্তের স্থান আমেরিকার সোমায়া।
- নরওয়েতে মধ্যরাতে সূর্যোদয় হয়।
- সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান মেঘালয়ের মৌসিনরাম।

ভালো কথা

সুমনের দাদু

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখি আমাদের পাড়ার সুমনের দাদু রাস্তার ধারে বসে কী যেন করছে। কাছে গিয়ে দেখি ইট দিয়ে বাঁশ-কাঁটা ভাঙছে। আমরা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, ‘অশ্বত্থগাছে কাকে বাসা করছে। তা থেকে কিছু বাঁশ-কাঁটা রাস্তায় পড়ছে। প্রতিদিন কত লোকের পায়ে কাঁটা ফুটছে। তাই কাঁটাগুলো বসে বসে ভাঙছি। যাদের পায়ে জুতো থাকে না তাদের এতে খুবই কষ্ট হয়। জুতো পায়ে থাকলেও জুতো ভেদ করে পায়ে বিঁধে। বেড়বাঁশের কাঁটা তো, খুব যন্ত্রণা হয়।’ আমার তখন মনে হচ্ছিল সুমনের দাদুর মতো সব মানুষ যদি হতো!

সুবীর কুমার, অষ্টম শ্রেণী, বাগমুণ্ডি, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

মায়ের বকুনি

মৌনব দাস, সপ্তম শ্রেণী, টি.পি. রোড, কলকাতা-৬

মা তুমি আমায় বকছো কেন
করেছি কোনও ভুল যেন!
মন থাকে শুধু আমার পড়াই
স্কুলও করি না কোনওদিন কামাই।
আজকে আমি করিনি লড়াই
হয়ে ছিলাম দিদির প্রিয় ভাই,
পড়া ছেড়ে যাইনি আমি খেলতে
তবু কেন তুমি সবসময় থাকো তেতো!

আজ নষ্ট করিনি কারোর সম্মান
ভিখারিকে করেছি দু’টি দান,
তবু মা, আমায় বকছো কেন
আমি তোমার চোখের বালি যেন!
রাগটা ভুলে মা হেসে বলে—
তুই যে আমার খুবই ভালো ছেলে,
বকলে ’পরে ভালো থাকবি
এ কথাটি মনে রাখবি।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

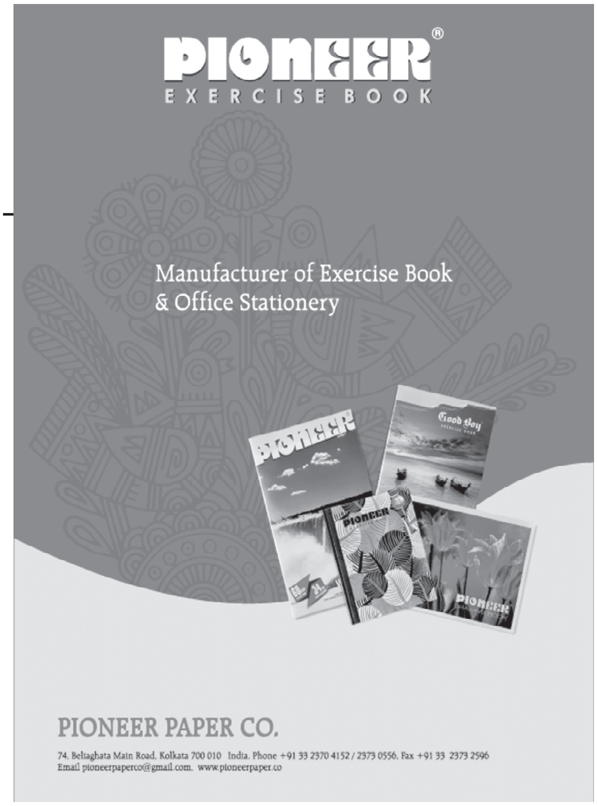
PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery
PIONEER
Good Boy
PIONEER
PIONEER

PIONEER PAPER CO.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

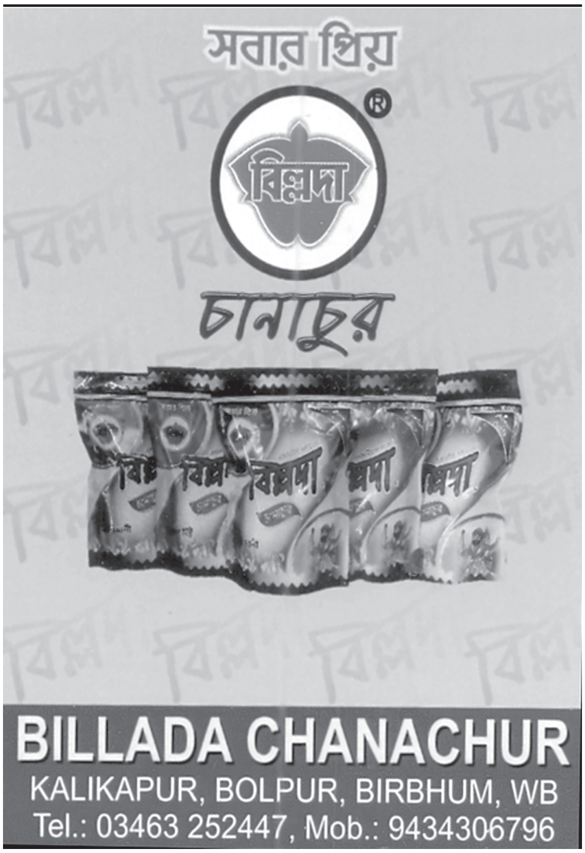
সবার প্রিয়
বিল্লদা®
চানাচুর
বিল্লদা

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

Swastika Weekly, **RNI No. 5257/57** Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
29 January - 2018 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles
LIGHTING
PIPES
APPLIANCES
FANS
Innovative
DESIGN
World-class Quality
PRODUCTS
Just One Name
SURYA

SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা।।